মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির প্রতিবাদ রাজ্যজুড়ে

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙার অগণতান্ত্রিক হুমকির প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র টিফিন বিরতির সময় কর্মচারীরা বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হয়ে রাজ্য সরকারের প্রধান কাণ্ডারীর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। একই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘৃণ্য প্ররোচনামূলক মন্তব্যের কারণে যদি রাজ্যের কোথাও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোনও স্তরের কোনও কর্মী বা সংগঠন দপ্তর আক্রান্ত হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই গ্রহণ করতে হবে বলে সভাগুলিতে সমস্বরে ধ্বনিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত সরকারের অনুগামী কিছু সংগঠনকে একত্রিত করার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া রাজ্য প্রশাসনের ৮০ শতাংশ কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার হিংস্র হুমকি প্রদর্শন করেন তাঁর অনুগামীদের কাছে। বিগত পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশসমূহ বর্তমান সরকারের অন্ধকার কুঠুরিতে আবদ্ধ। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশন ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বকেয়া হতে হতে ৪২ শতাংশে পৌঁছেছে। কর্মচারীদের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারসমূহ একে একে কেড়ে নিতে শুরু করেছে। এমনকি প্রতিহিংসামূলকভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে যত্রতত্র বদলী করে দিচ্ছে। এই সামগ্রিক সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের কর্মচারীদের তীব্র অসন্তোষ তৈরী হয়েছে। কর্মচারীদের ক্ষোভকে বাঙ্ময় করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ইতোমধ্যেই পত্র মারফত প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে। এমনকি বকেয়া মহার্ঘভাতা এবং রাজ্য কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনেরও দাবি জানিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কর্মচারীদের দাবির প্রতি বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে, কর্মচারীদের দাবি নিয়ে আন্দোলনকারী একমাত্র সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙার হুমকি আক্ষরিক অর্থে স্বৈরতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য প্রশাসনের হুমকির বিরুদ্ধে কলকাতাতে ৫৫টির বেশী দপ্তরের কর্মচারীরা অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় অংশগ্রহণ করেন। খাদ্যভবনে প্রশাসনিক অনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেই কর্মচারীরা প্রতিবাদ সভায় শামিল হন। এছাড়াও কলকাতার বাকি ছ'টি অঞ্চলের প্রতিটি বড় দপ্তরে কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

খাদ্য ভবনে কর্মচারীদের বিক্ষোভ সভা

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় ধিক্কৃত হল মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি। শিলিগুড়ি মহকুমার সর্বত্র সরকারী দপ্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই কর্মসূচী পালিত হয়। জলপাইগুড়ি

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত

বেতন কমিশন সহ ৫ দফা দাবিতে ৬ মার্চ, ২০১৪ দেশব্যাপী জমায়েত ও ধর্না

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৪ মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান আর জি কার্ণিক।

সারা দেশের ১৬টি রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠন এই সভায় অংশগ্রহণ করে। সভার শুরুতে আয়োজক সংগঠন মহারাষ্ট্র জিলা পরিষদ এমপ্লয়িজ কনফেডারেশনের সভাপতি উমেশচন্দ্র চিলবুলে উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

সূচনায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আর মুখুসুন্দরম একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

সভাপতি আর জি কার্ণিক তাঁর প্রাথমিক ভাষণে উল্লেখ করেন যে আসন্ন ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বলগাহীন দুর্নীতি, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির উল্লেখ করে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দেশব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের কঠোর সংগ্রামের উজ্জ্বল দিকটির উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ষাট লক্ষ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংগঠন শুধু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরই নয় সারা দেশের খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থরক্ষায় আগামী দিনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

> ৬ মার্চ ২০১৪
> ৫ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় জমায়েত
> কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল, বিকেল ৫ টায়
>
> ৮-৯ মার্চ ২০১৪
> ১২ই জুলাই কমিটির রাজ্য কনভেনশন
> নিরঞ্জন সদন
> (যাদবপুর, কলকাতা)

সাধারণ সম্পাদক আর মুখুসুন্দরম তার ভাষণের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৩ সংসদ অভিযানে ফেডারেশনের পতাকাতলে প্রায় দশ হাজার কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সংকটমুক্ত হওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস এবং সংকটের বোঝা সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটি তুলে ধরে বলেন এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশে বিকল্প আর্থিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা দেন কীভাবে কর্পোরেট হাউস, রাজনৈতিক দল ও এক শ্রেণীর আমলার অনৈতিক আঁতাতের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ক্রমশ আরও গরীব হচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন যে পেনশন বেসরকারীকরণ বিল আইনে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের সরকার পেনশন ফান্ডে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পেনশন ফান্ডে সঞ্চিত টাকা থেকে প্রায় ৩৫০০০ কোটি টাকা শেয়ার মার্কেটে লগ্নী করা হয়েছে। যখন দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তখন কেন্দ্রীয় সরকার শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাজ্য সরকারগুলিও লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। অপরদিকে আউটসোর্সিং ও চুক্তি প্রথায় নিয়োগ ক্রমশ বাড়ছে।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা আপনার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক অনুগামী অথচ নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত কয়েকটি তথাকথিত সাইনবোর্ড সর্বস্ব কর্মচারী সংগঠনকে জোড়াতালি দিয়ে কোনোক্রমে খাড়া করার জন্য, আপনি যে সভা ডেকেছিলেন—সেই সভায় পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙার আহ্বান জানিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটি কথা আপনাকে জানানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। শুরুতেই বিনম্রভাবে আপনাকে জানাই, আপনার মন্তব্য আমাদের যত না ক্ষুব্ধ করেছে, তার থেকে অনেক বেশি হাসির খোরাক যুগিয়েছে।

তবে প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোটাও আমাদের কর্তব্য। কারণ ২২ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কিছু অনুগত কর্মী পরিবৃত হয়ে, আপনার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সম্পর্কে যে বিষোদ্‌গার আপনি করেছেন, তাতে আপনার ইতিহাস সম্পর্কিত সুগভীর জ্ঞান সম্পর্কে যে অসম্পূর্ণ ধারণা আমাদের মধ্যে ছিল তার অবসান ঘটেছে।

দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আপনার সুগভীর পান্ডিত্যের (!) পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, যখন সরকারী (বা দলীয়, কারণ আপনার জমানায় এদু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই) সভা মঞ্চে আপনি সিদো-কানহুর পাশাপাশি ডহরবাবুর (!) আত্মীয় পরিজনকেও আপনার প্রসাদ বিতরণের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অথবা ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় অনশনরত গান্ধীজির পাশে রবীন্দ্রনাথের (যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হন ১৯৪১-এ) উপস্থিতির তথ্য রাজ্যবাসীকে জানিয়েছিলেন। স্বভাবতই আপনার ইতিহাস সম্পর্কিত বিপুল জ্ঞান ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার বা অমলেশ ত্রিপাঠির মতন ইতিহাসবিদদেরও লজ্জা দেবে, এমন ধারনাই আমাদের মধ্যে ছিল।

কিন্তু এবারে যেহেতু আপনার সিলেবাসে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নাম উঠে এল, তাই উপেক্ষা স্বরূপ নীরব থাকা আর সম্ভব হল না।

আপনাকে জানাই, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়, সেই রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে বসে গঠিত হয় নি। আপনি এমন ভাবতেই পারেন, কারণ যে রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা ধরে আপনার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল, সেই দলের আপনার পূর্বসূরি নেতারা চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে বসে একদা একটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন, আপনারই মতন একইরকম মনোবাসনা নিয়ে। কিন্তু তাঁদের সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় নি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অগ্রগতি রোধ করা তো দূরের কথা, তাঁরা নিজেরাই শত টুকরো হতে হতে বিলীন হয়ে গেছেন।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, কিন্তু একই পথে নয়। দয়া করে কার্ল মার্কসের নাম শুনে ক্ষিপ্ত হবেন না, বা রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজি সম্পর্কিত স্বকপোলকল্পিত কোন উদ্ভট তত্ত্ব হাজির করবেন না। দেখুন, না জেনে বুঝেও আপনি মার্কসকে সঠিক প্রমাণ করলেন। আপনার পূর্বসূরীরা চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে বসে কিছুটা গোপনীয়তার সাথে যা করতে চেয়েছিলেন, আপনি তাই করলেন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। কিন্তু উভয়ের পরিণতি হবে একই। কারণ পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অপূর্ণ দাবিদাওয়া আর আঘাতপ্রাপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ যে দুর্বার আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, সেই আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতারই মূর্ত রূপ ছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আজ থেকে প্রায় ছ'দশক আগে যার পথ চলা শুরু। অর্থাৎ আগে সংগঠন তৈরী করে আন্দোলনের নাটক করা নয়, আন্দোলন-সংগ্রামের ময়দান থেকেই সংগঠনের উত্থান। আশা করি এই তফাৎটুকু আপনি বুঝবেন। আপনার পূর্বতন রাজনৈতিক দলের তাবড় তাবড় নেতারা, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্বভার সামলেছিলেন, তাঁদেরও মনোবাসনা ছিল একই রকম। একই ধরনের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন হুমকি তাঁরাও বিভিন্ন সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্কশ বাস্তব হল, তাঁরা জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অগ্রগতি থামে নি।

আপনারই মত সন্ত্রাসকে উপজীব্য করে (যাঁর মরদেহ আপনি আপনার পূর্বতন দলের কাছ থেকে হাইজ্যাক করেছিলেন, মনে পড়ছে তো?)যিনি রাজ্যটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তিনিও আমাদের ৬০ জন সাথীর প্রাণ কেড়ে নিয়েও আমাদের অগ্রগতি থামাতে পারেন নি। আপনার অভিজ্ঞতাও তো একইরকম তাই না? গত তিনবছরে কতভাবেই তো চেষ্টা করছেন। পারছেন কি আমাদের কর্মচারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে? যদি পারতেন, তাহলে তো প্রশাসনিক প্রধান হয়েও, এমন ন্যক্কারজনক হুমকি দেওয়ার প্রয়োজন হত না।

আসলে পূর্বসুরির মতই আপনিও ভুল পথে যাচ্ছেন। কর্মচারীদের বঞ্চনা থাকবে, দাবিদাওয়া পূরণ হবে না, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার হতে হবে আর তাঁরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গ ত্যাগ করবে—এটা কখনই সম্ভব নয়।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দাবিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সমীপে পত্র

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ

পত্র নং ঃ কো-অর্ডি-১৯/১৪
কলকাতা, তারিখ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

মহাশয়া,

আপনি নিশ্চিতভাবে অবহিত আছেন যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশসমূহ এবং কারিগরী কর্মচারীদের জন্য তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) সুপারিশসমূহ রাজ্য সরকার এখনও রূপায়ণ করে নি। এর ফলে সমগ্র কর্মচারী সমাজের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরী হয়েছে।

এছাড়া আপনি জানেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৩২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বেশ কিছুকাল ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে। অতিসম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য আরও ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা (সর্বমোট ১০০ শতাংশ) পাওনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এবং তা অনতিবিলম্বে ঘোষিত হতে চলেছে বলে জানা গেছে। এর পরিণামে কর্মচারী মানসে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায় ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অবশিষ্ট সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য এবং একই সঙ্গে বকেয়া ৩২ শতাংশ মহার্ঘভাতা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।

সাথে সাথে আমরা আরও জানাতে চাই যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য ইতোমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে এবং সম্প্রতি সেই কমিশনের সদস্যদের নামও কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে।

এমত পরিস্থিতিতে আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে মহার্ঘভাতা সর্বমোট ১০০ শতাংশ পাওনা হওয়ায় এই বেতন কমিশনের সুপারিশ ১লা জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
[signature]
সাধারণ সম্পাদক

সংগ্রামী হাতিয়ার

ফেব্রুয়ারি ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
দ্বিচত্বারিংশত্তম বর্ষ □ দশম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

অবশেষে নন্দীগ্রামের পর্দা উঠল

সময়টা ২০০৭ সাল। জনসাধারণের বিপুল সমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার তখন সবেমাত্র পথচলা শুরু করেছে। প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য কৃষির সাফল্যকে সংহত করে গ্রহণ করা হয়েছে দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচী। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত শ্রমনিবিড় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প—সমস্ত ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের প্রস্তাব ও পুঁজি নিয়ে এগিয়ে আসছে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও শিল্পপতি গোষ্ঠী। অবশ্যই বামফ্রন্ট সরকারকে ভালবেসে বা আদর্শগত সহমতের কারণে নয়। তারা আগ্রহ প্রকাশ করছে রাজ্যের সুস্থিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে তুলনামূলক উন্নত অবস্থা, উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো এবং সর্বোপরি একটি ক্রমপ্রসারমাণ শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বাজারের হাতছানিতে। এককথায় শিল্পায়নের সম্ভাবনা দ্রুত বিকশিত হতে শুরু করেছিল এই বাংলায়।

এমনই শিল্প-বিনিয়োগের অনেকগুলি প্রস্তাবের মধ্যে এসেছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-১ এবং ২নং ব্লকের একাংশ জুড়ে কেমিক্যাল হাব গঠনের প্রস্তাবও। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু যা রাজ্য তথা সাধারণ রাজ্যবাসীর জন্য ছিল মঙ্গলজনক, তা সম্ভবত অসাধারণ (?) কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য আদৌ সুখকর হত না। তাই নন্দীগ্রামে শিল্পতালুক গঠনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন, এই সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারিত হতেই শুরু হল তথাকথিত 'নন্দীগ্রামের লড়াই। কারা ছিলেন এই 'লড়াই'-এর নেতৃত্বে, তা রাজ্যবাসী সকলেরই জানা। শুধু রাজ্যে নয়, দেশব্যাপী এমনকি দেশের বাইরেও এই লড়াই-এর গৌরবগাঁথা (?) পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল নানান ধরনের গণমাধ্যম। লড়াই-এর নামে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য বামফ্রন্ট বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একজোট করে প্রথমে গঠিত হয়েছিল 'কৃষি জমি রক্ষা কমিটি', যার নাম পরে পরিবর্তন করে করা হয় 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরাসরি সংঘর্ষে যাবার ইঙ্গিতটা ছিল স্পষ্ট। কিন্তু শিল্পায়ন, তা সে ছোট, বড়, মাঝারি যাই হোক না কেন—কম-বেশী কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, বেকার যুবক-যুবতীদের মুখে হাসি ফোটায়। আর নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব-এ তো এ সম্ভাবনা ছিল অনেকটাই। এই ধরনের জনস্বার্থবাহী কর্মসূচীকে বানচাল করতে এবং আরও অনেক বেশী জনহিতৈষী সাজার জন্য কখনও সত্যকে অবলম্বন করে এগোনো যায় না। প্রয়োজন হয় গুজব আর মিথ্যাচারের। কারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে পক্ষে আনতে হলে গুজব আর মিথ্যাচারই হল সর্বোৎকৃষ্ট দাওয়াই। নন্দীগ্রামেও একের পর এক ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' তাদের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে পেরেছিল। গুজব কিছুটা জলে ভেসে ওঠা বুদবুদের মত। বুদবুদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং অচিরেই ফেটে গিয়ে হারিয়ে যায়। গুজবও তাৎক্ষণিক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও, সময়ের সাথে সাথে তা হারিয়ে যায় অচিরেই। ফলে মানুষের স্মৃতিতে তা পাকাপাকিভাবে ঠাঁই পায় না।

নন্দীগ্রামেও এমনভাবে সৃষ্ট কয়েকটি গুজবকে ভিত্তি করেই আন্দোলনের সলতে পাকানো হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধানে সেগুলি আমাদের স্মৃতি থেকে প্রায় হারিয়েই গেছিল, কিন্তু নতুন করে উসকে দিল সি বি আই-এর চার্জশিট। মিথ্যাচার আর গুজবের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী হলেও, অন্তর্নিহিত সত্য উন্মোচিত হতে কিছুটা সময় লাগে। বিশেষ করে সেই সত্য সর্বজনীন চেহারা নিতে তো সময় লাগেই। কারণ গুজবের চূড়ান্ত ঘূর্ণির মধ্যেও একাংশের মানুষ, সংখ্যায় কম হলেও, এ যে সত্য নয় তা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সেই কথা শোনার মত কানগুলি তখন ফাঁকা থাকে না—গুজবের উত্তাল মৃদঙ্গ বাজে। নন্দীগ্রামেও যে গুজবগুলিকে সাধারণ মানুষকে সত্য বলে গেলানো হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটি হল—

(ক) জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করতে সরকারী আধিকারিকরা কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে গেছেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল তাঁরা গেছিলেন 'নির্মল গ্রাম' সংক্রান্ত কাজে।

(খ) হলদিয়া থেকে লঞ্চে এসে, লঞ্চের ছাদ থেকে হার্মাদবাহিনীর সোনাচূড়ায় গুলিবর্ষণ। প্রকৃত সত্য : হলদিয়া থেকে সোনাচূড়া পর্যন্ত যাওয়ার কোন জলপথ নেই।

(গ) নন্দীগ্রামে গণহত্যা। অসংখ্য মানুষের পেট কেটে পাথর পুরে হলদি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত সত্য : অসংখ্য কেন, একজন মানুষের লাশও হলদি নদীতে পাওয়া যায় নি। এমনই আরও বহু অসত্য বক্তব্য দানা বেঁধেছিল সেই সময়ে। প্রকৃত সত্যগুলি সেই সময়েও কিছু মানুষ বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চক্রান্তের শরিক সেইসব গণমাধ্যমের সমবেত কোরাসে তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেই সত্যই আবার মাথা তুললো বহুদিন পর, সি বি আই-এর অনুসন্ধানলব্ধ রিপোর্টের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ততদিনে যে লক্ষ্যে নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরের শিল্পায়নকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, গোটা রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হয়েছিল, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে নন্দীগ্রাম কাণ্ডের যারা প্রধান হোতা—বিরোধী থেকে শাসক দলে উত্তরণ ঘটেছে তাদের।

তবু দেরীতে হলেও সত্য উন্মোচিত হবার মধ্য দিয়ে আশা করা যায়, আগামী দিনে বঙ্গবাসী গুজব আর সত্যের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি বা নির্ণয় করতে আরও অনেক বেশী সতর্ক হবেন।

পুনশ্চঃ সত্যকে যাচাই করেও নেওয়া গেল। কারণ যে বিরোধীদল কথায় কথায় সিবিআই তদন্ত দাবি করত, আজ শাসকের চেয়ারে বসে সেই সি বি আই রিপোর্টকেই তারা অস্বীকার করছে। সত্যিই যদি নন্দীগ্রামের লড়াই হতো কৃষকের স্বার্থে, তাহলে এই ভয় কেন? □

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

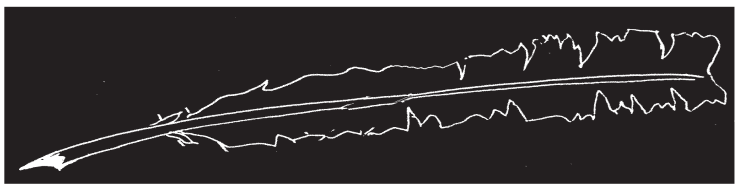

'দ্বি-লাড্ডু তত্ত্ব' বনাম 'দিল্লি চলো'

সম্প্রতি কিয়ৎকালের ব্যবধানে দুইটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। উদ্ধৃতিদ্বয়ের একটির উদ্‌গাতা এই মুহূর্তে মদীয় দেশের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী শ্রীযুক্ত নমো মহাশয় (মিডিয়াকূল বর্তমানে উক্ত নামেই তাঁহাকে সম্ভাষিত করিতেছে)। তিনি কলকাতাস্থিত ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে তাঁহার দলীয় কর্মী-সমর্থকদিগের সম্মুখে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলিয়াছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পর্বে দুইখানি লাড্ডু পশ্চিমবঙ্গবাসীর করতলগত হইবে। দুইখানির মধ্যে একটি তিনি স্বয়ং এবং অপরটি অধুনা বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিতা বঙ্গেশ্বরী। দুইখানি লাড্ডু অতঃপর মিলিয়া মিশিয়া রাজ্যের উন্নয়নের কর্মসূচী ত্বরান্বিত করিবে। অবশ্য দুইখানি লাড্ডু একত্রে গলাধঃকরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর পরিপাকগত কোনরূপ বিপত্তি হইবে কিনা তাহা নমো মহাশয় বলেন নাই। কিমাশ্চর্যম, নমো মহাশয়ের বঙ্গে আবির্ভাবের কিয়ৎ দিবস পূর্বেই বঙ্গেশ্বরী ঐ একই স্থানে মঞ্চ খাটাইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন 'দিল্লি চলো'। অর্থাৎ রাজ্যপাট সামলাইবার বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ হইলেও, তাঁহার প্রয়োজন বৃহত্তর ক্ষেত্র, যাহা লাগাতার উৎসব, মেলা, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারীর প্রয়োজনীয় বর্ধিত রসদ যোগাইতে সক্ষম হইবে। তাই বঙ্গীয় জনগণের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে নীরব থাকিয়া তিনি দিল্লি যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ ইহা সর্বজনবিদিত যে, পশ্চিমবঙ্গে গুটি কয়েক আসনের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় স্তরে তিনি বিশেষ 'কলিকা' পাইবেন না। তথাকথিত 'ফেডারেল ফ্রন্ট' গঠনের স্বপ্নও অদ্যাবধি সূর্যের মুখ দ্যাখে নাই। সর্বভারতীয় স্তরে কাহাকেও পাশে না পাইয়া খড়কুটোর ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন আন্না হাজারে মহাশয়কে। বিপরীতে আন্না হাজারে মহাশয়ও বর্তমানে নিঃসঙ্গ। তাঁহার দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সাথী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বর্তমানে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতেছেন। অগত্যা আন্না সাহেব তাঁহার দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের গান্ধীরূপী ইমেজ পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষু মুদিয়া সারদা কেলেঙ্কারিতে কলংকিত হাত ধরিয়াছেন, সম্ভবত ভবিষ্যতে কোন অনাস্বাদিত ফল লাভের আশায়। লক্ষণীয় বঙ্গেশ্বরী 'দাঙ্গা চাহি না' ইত্যাদি ভাসা ভাসা কিছু মন্তব্য করিলেও নমোজীর দ্বি-লাড্ডু তত্ত্বের বিরোধিতা করেন নাই। কারণ তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন, দিল্লি চলো বলিলেই যাওয়া যাইবে না। তাহাকে প্রয়োজনে শক্ত-সমর্থ কোন হাত ধরিতে হইবে।

এমতাবস্থায় সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে যখন তিনি মুখ খুলিতেছেন তখনও তাঁহার আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু হইতেছে বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলটি এবং বামপন্থীগণ। নমো মহাশয় সম্পর্কে তাঁহার ভাব-ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত নমনীয়।

স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গবাসী সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে 'নমো-মম' সমীকরণ গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। অর্থাৎ দ্বি-লাড্ডু তত্ত্বও 'দিল্লি চলো'কে মিলাইয়া দিবার উদ্যোগ শুরু হইয়া গিয়াছে।

আমরা প্রমাদ গণিতেছি। এমত ঘটনা যদি সত্যই ঘটে, কেন্দ্র ও রাজ্যের তখত্-এ তাউস্-এ দুই স্বৈরাচারী ব্যক্তির একত্রে আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহারা ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভাগ করিয়া লন, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর বিপদের আর অন্ত থাকিবে না। □

১৩ ফাল্গুন, ১৪২০

শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ পিট সিগার

"কবি যখন কথা বলেন, কিংবা অস্ত্র হাতে নেন, তখনও তিনি একই ব্যক্তি"। কোনো গায়কের গান যখন অস্ত্র হয়ে ওঠে তখনও তিনি একই ব্যক্তি— শ্রেণী সংগ্রামের অনন্য প্রত্যয়, আজীবন এক লড়াকু সৈনিক— শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্নকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চলমান ইতিহাসের এক অন্যতম কারিগর।

শারীরিক মৃত্যু কি কোনোদিন তাঁর কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে পারে? মৃত্যুহীন সংগ্রামের যে পথ পিট সিগার দীপ্ত করে গেছেন সুরে ও কথায়, সেই পথের যাত্রা চলতেই থাকবে... কোনোদিন তা ফুরিয়ে যাওয়ার নয়।

শ্রেণী সংগ্রামের অনন্য সৈনিক কিংবদন্তী সংগীতস্রষ্টা পিট সিগার প্রয়াত হলেন ২৭ জানুয়ারি ২০১৪, চুরানব্বই বছর বয়সে। কিংবদন্তী শুধু এই জন্য নয় যে তিনি এক অবিস্মরণীয় গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী। কিংবদন্তী এই জন্য গোটা জীবন জুড়ে সংগীত জগতের মানচিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর গানে। তাঁর গানে সারা পৃথিবী আজও উত্তাল পথে-প্রান্তরে লড়াইয়ে ময়দানে। তাঁর গাওয়া অথবা সৃষ্ট 'We shall overcome' (আমরা করবো জয় নিশ্চয়), 'জো-হিল', 'Guantanamera' (গুয়েন্তানামেরা) এবং 'Where have all the flowers gone' (ফুলগুলি সব কোথায় চলে গেল) ও 'If I had a hammer' (আমার হাতের হাতুড়ী) প্রভৃতি।

১৯৩৪ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে বিপ্লবীদের সমর্থনে সারা পৃথিবী থেকে লড়তে যাওয়া বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মী, লেখক, কবি, গায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শ্রমজীবী মানুষ, সমাজকর্মীদের নিয়ে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক বিগ্রেড, সেখানকার গণতান্ত্রিক মানুষ, শ্রমজীবী মানুষদের সমর্থনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য। সেই অনুপ্রেরণায় তাঁর গান 'Songs of the Lincoln Battalion' (লিঙ্কন বাহিনীর গান)-এর মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু। ১৯৩৬ সালে ১৭ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের যুব কমিউনিস্ট লীগ-এর সদস্য এবং ১৯৪২ সালে তিনি হয়ে ওঠেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির একজন পূর্ণ সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাকার্থি যুগে' শুরু হল শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের উপর নজরদারি এবং খবরদারি। কমিউনিস্ট ভূত তাড়ানোর নামে চলতে থাকলো শিল্পীর স্বাধীনতার

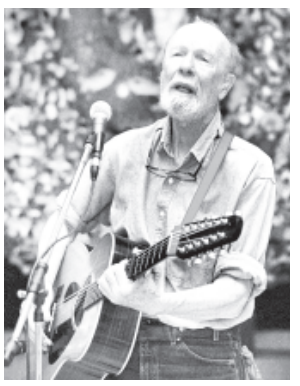

কবর, সাধারণ মানুষের ওপরেও নিগ্রহ ও নির্যাতন। পিট সিগার পরিচালিত গানের দল 'The Weavers' কালো তালিকাভুক্ত হল। পিট সিগারকে তলব করল কুখ্যাত সংস্থা 'House Un American Activities Committee'। পিট ওদের মুখোমুখি সরাসরি উত্তর দেন তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ কি অথবা কাকে তিনি ভোট দিয়েছেন সেইসব উত্তর কারো কাছে দিতে তিনি বাধ্য নন। ফলে মার্কিন সংসদ অবমাননার দায়ে এক বছর জেল হয় এবং তাঁকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। আমেরিকা টিভি এবং রেডিও তাঁকে বয়কট করে ওপর তলার নির্দেশে।

ষাটের দশকে আমেরিকার নাগরিক আন্দোলন, ভিয়েতনামের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন পিট সিগার। তাঁর গাওয়া 'আমরা করব জয় নিশ্চয়' পৃথিবীর যে কোনো মুক্তি সংগ্রামের ভাষা ও তার প্রেরণা। পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এ গান। পিট সিগার হয়ে ওঠেন, 'যেখানেই অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ'— পৃথিবীর এই মুক্তি সংগ্রামের স্লোগান রচনার অন্যতম কারিগর। ষাটের দশকের সংগ্রামের শেষের দিকে শুরু হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী উত্তাল লড়াই। নভেম্বর ১৯৬৯ পাঁচ লক্ষ লোকের এক বিশাল মিছিল ছুটে যায় হোয়াইট হাউসের দিকে, আর সেই মিছিলে নেতৃত্ব দেয় পিট সিগারের কণ্ঠে 'জন লেনন'-এর বিখ্যাত গান 'Give peace a chance'।

তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। গড়ে তুলেছেন 'People song organisation' মার্কিন লোকসংগীত পুনরুজ্জীবনের কাজ— যার সুরে সুর শ্রমজীবী আম-জনতা ও সংগ্রামের জীবনচর্যা। অনুষ্ঠানের মঞ্চে পাওয়া যেত প্রাণশক্তিতে ভরপুর পাঁচ তারে ব্যাঞ্জো হাতে গানওয়ালা পিট সিগারকে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই। সর্বদা মাথা উঁচু, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাগ্রত বিবেক। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও আফগানিস্তানে মার্কিনি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সহমর্মিতার সংগ্রামে, ইরাকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিছিলে, জমায়েতে প্লাকার্ড হাতে। তার বিখ্যাত 'গান' 'Turn, Turn,Turn (ঘুরে দাঁড়াও, ঘুরে দাঁড়াও, ঘুরে দাঁড়াও)''। পূর্বে উল্লেখিত পিট সিগারের নিজের হাতে সৃষ্ট 'উইভার্স' দল (যা কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিল) গর্জে উঠতো ট্রেড ইউনিয়ন সমাবেশে কিংবা ধর্মঘটী শ্রমিকদের জমায়েতে, মিছিলে, ব্যারিকেডে। জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনো পুরস্কারই তাঁকে সংগ্রামের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

অক্টোবর ২০১১ 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট' আন্দোলনেও সামনের সারিতে ৯২ বছরের পিট সিগার। তাঁর গানের ধারায় উদ্বেলিত হয়ে একটি অসম্ভব শক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্রের দিকে আঙুল উচিয়ে এই আন্দোলন গর্জে উঠলো— 'আর নয় বন্ধ হোক এই জঘন্য ব্যবস্থা, আমরা ৯৯ তোমরা এক। আমরা আমাদের মতো সবাই মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। লড়েই নেব অধিকার আমাদের শ্রমে, আমাদের সংঘর্ষে। গড়ে তুলবো আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র।' তিনি ছিলেন বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ের অক্লান্ত সৈনিক।

অবাক আমাদের এই বাংলায় আমরা গাইছি 'ফুলগুলি সব কোথায় চলে গেল?' ফুলগুলি সব চলে যেতে শুরু করেছে অসংখ্য মুক্তি সংগ্রামের শহীদ স্মরণে, অসংখ্য কৃষকের আত্মহত্যার শোভাযাত্রায় আর নির্যাতিতা, ধর্ষিতা হওয়ার পর হত্যা হওয়া মা বোনেদের মৃতদেহের কাছে। ''কাল রাতে জো হিলকে স্বপ্নে দেখেছি। জো হিল কখনো মরে না। আমি বলি জো তুমি বহুকাল মৃত। জো বলে মরি নি আমি।'' অসংখ্য শহীদের রক্ত রঞ্জিত বাংলা এই গানই ঠোঁটে ঠোঁটে উচ্চারণ করছে। ''আমি যদি পাই / সেই হাতুড়িটা ভাই / ... শুধু হাতুড়ি পেটাই / ... ভেঙে করি চুরমার / শৃঙ্খল ভেঙে আয় / মুক্তির গান গাই।'' এই শোষণের, এই শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা, প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা সর্বত্রই একই রকম। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধও সর্বত্র একই রকমের। সঙ্গীতের অন্তহীন যাত্রায় পৃথিবীর গ্রাম-নগর জুড়ে ছড়িয়ে রইল বিশ্বাস আর বেঁচে থাকার আকাঙ্খার দীপ্তমশাল। বেঁচে রইল কারখানার ভিতরে, খনির অন্ধগহ্বরে, কৃষকের ক্ষেত খামারে, কলেজ ক্যাম্পাসে। ধর্মঘটী শ্রমিকের প্রত্যাশায়, হাটে বাজারে আর আমাদের রক্তস্নাত এই বাংলায়। মুখের জবান বন্ধ করতে যাওয়া এই বাংলার মিছিলে সমাবেশে, শ্লোগানে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে এবং ব্যারিকেডে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও গাইছি ''আমরা করবো জয় নিশ্চয় / আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয় / আমরা করবো জয় নিশ্চয়...''। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

রাজ্য সরকারের তুঘলকী ফরমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলুন

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব একগুচ্ছ আদেশনামা প্রকাশ করেছেন। 'নবান্ন' থেকে প্রকাশিত এই আদেশনামাগুলি সরকারী দপ্তরে আসার আগেই মিডিয়ার নজরে আসে। এ নিয়ে হই হই পড়ে যায়। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা রকম মতামত সংবাদপত্রগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারিত হয়। এর অব্যবহিত পরেই সংগঠনের পক্ষ থেকে আদেশনামাগুলি খতিয়ে দেখা শুরু হয় এবং এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ফলাফল পর্যালোচনা করে এই সকল আদেশনামা অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ টিফিন বিরতিতে কর্মচারী জমায়েত ও বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়, সমগ্র কর্মচারী সমাজ এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে।

এই সকল আদেশনামার (চারটি) মধ্যে (১) নং নোটিফিকেশনে [নং-১৭৫ এফ (পি) তারিখ ৯ জানুয়ারি' ১৪] পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক বিধি, ১ম খণ্ডের সংশোধন ঘটিয়ে ৫ নং বিধিতে ২টি ক্লজ যুক্ত করে 'ডেপুটেশন' এবং 'ডিটেলমেন্ট' এর অর্থ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐ কৃত্যক বিধির ১২ নং অধ্যায়ে 'ফরেন সার্ভিস'-এর শিরোনাম পরিবর্তন করে 'ফরেন সার্ভিস' ডেপুটেশন অ্যান্ড ডিটেলমেন্ট' করে এর পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ৯৭ নং বিধির নতুন নম্বর দেওয়া হয়েছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি উপবিধি ও তার নোট আকারে যুক্ত করা হয়েছে। ৯৮ নং বিধির (ক) ধারায় ফরেন সার্ভিসে বদলীর মান্য বিষয়টির অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। (২) নং নোটিফিকেশনে যুগ্ম সম্পাদক, [নং-১৭৬-এফ(পি) তারিখ ৯ জানুয়ারি'১৪] পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডার) বিধি ১৯৮৪ এবং (৩) নং নোটিফিকেশনে [নং-১৭৭-এফ(পি) তারিখ ৯ জানুয়ারি' ১৪] পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক (সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডার অফ ডেপুটি সেক্রেটারিজ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিজ) বিধি, ১৯৮৪-র সংশোধন ঘটিয়ে অন্য যে কোনো সেক্রেটারিয়েট ডিপার্টমেন্ট বা অফিস এবং আঞ্চলিক স্তরের অফিসগুলিকে যুক্ত করা বা বিযুক্ত করার কর্তৃত্ব অর্থ দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে [নোট ওয়ান টু সাবরুল (ওয়ান) অব রুল ফোর] এবং ৫ নং বিধির উপবিধি তিনে একটি নতুন ধারা যুক্ত করে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের হাতে ফরেন সার্ভিসে বদলী বা ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্টে কর্মচারীদের পাঠানোর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

(৪) নং মেমোরেন্ডামে [নং ৩০৭—এফ(পি) তারিখ ১৭ জানু '১৪] উপরে বর্ণিত সংশোধনীগুলি উল্লেখ করে বলা হয়েছে ফরেন সার্ভিসে বদলী বা ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্টে সার্ভিস ইউটিলাইজেশন ইত্যাদি বিষয়গুলি কমন ক্যাডারগুলির ক্ষেত্রে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ 'কেস টু কেস' বিবেচনা করে (পড়ুন ইচ্ছে-খুশী) সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং যে কোনো সার্ভিস/ক্যাডার/পোস্টের কর্মচারীকে অন্য যে কোনো সার্ভিস/ক্যাডার/পোস্টে অর্থ দপ্তরের অনুমতি নিয়ে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বদলী বা ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্ট বা সার্ভিস ইউটিলাইজেশনে পাঠাতে পারবেন।

আপাতদৃষ্টিতে এই নতুন আদেশনামাগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হিসাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বা উন্নয়নমূলক কাজে কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে ব্যবহার করার কথা বলা হলেও এর পেছনে লুক্কায়িত আছে অনেক গূঢ় উদ্দেশ্য এবং গভীর অভিসন্ধি। তাই এই সকল আদেশনামার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এর পরিপ্রেক্ষিত এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক আলোচনা এবং চর্চা জরুরী। প্রবল প্রতাপশালী কেন্দ্রীভূত আমলাবাহিনীকে ব্যবহার করে কর্মচারী সংগঠনের কর্মী-সংগঠক-নেতৃবৃন্দ-কর্মচারীদের হয়রানিমূলক বা প্রতিশোধপরায়ণভাবে বদলী, ফরেন সার্ভিসে বদলী, ডেপুটেশন, সার্ভিস ইউটিলাইজেশনের নামে ডিটেলমেন্টে পাঠানোর পরিকল্পিত চক্রান্ত কাজ করছে। এর লক্ষ্য হল প্রতিবাদী সংগঠনগুলিকে দুর্বল করা কিংবা সরকারের বশংবদ হতে বাধ্য করা। চলতি প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার প্রতিবন্ধক শক্তিকে অপসারিত করা।

আদেশনামাগুলির মধ্য দিয়ে সরকারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে। এক, সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডারের যেকোনো কর্মচারীকে তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে ফরেন সার্ভিসে বদলী, ডেপুটেশনে বা সার্ভিস ইউটিলাইজেশনের জন্য ডিটেলমেন্টে পাঠানো, ভারতের অভ্যন্তরে বা ভারতের বাইরে (কর্মচারীর সম্মতি নিয়ে) প্রেরণ; দুই, যে কোনো সার্ভিসের বা ক্যাডারের বা পোস্টে কর্মচারীকে অন্য যে কোন সার্ভিসে বা ক্যাডারে বা পোস্টে ফরেন সার্ভিসে বদলী, ডেপুটেশনে বা সার্ভিস ইউটিলাইজেশনের জন্য ডিটেলমেন্টে পাঠানো। তিন, সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডার রুলসের সংশ্লিষ্ট শিডিউলে আঞ্চলিক স্তরের অন্য যে কোনো সেক্রেটারিয়েট অফিস বা অন্যান্য অফিসকে যুক্ত করা বা বিযুক্ত করা যাবে।

অসিত ভট্টাচার্য
যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

এই বিধিগুলির পরিবর্তন বা সংশোধনের একটি সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট আছে। তা হলো অতি সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার একজন মাননীয় বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী লিখিতভাবে জানান যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোনো মহার্ঘভাতা পাওনা নেই। একে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার সমগ্র কর্মচারী সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। দপ্তরে দপ্তরে সৃষ্টি হয় তুমুল অসন্তোষ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ অন্যান্য কর্মচারী সংগঠন উত্তাল বিক্ষোভ সংগঠিত করে 'নবান্ন', মহাকরণ, খাদ্য ভবন সহ সারা পশ্চিমবাংলার অফিস প্রাঙ্গণ ও কমপ্লেক্সগুলিতে। জারি হয় বিক্ষোভ শ্লোগান মিছিল নিষিদ্ধ করে কালা সার্কুলার 'নবান্ন'-এ খাদ্য ভবনে। কর্মচারী সংগঠকদের বদলী করা হয় সকল নিয়মবিধি, রীতি লঙিঘত করে। এমন কি সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বদলে অন্য কর্তৃপক্ষ আদেশনামা বের করেন। সেই আদেশনামা বিভিন্ন ল'কোর্টে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীনহয় শেষ পর্যন্ত বদলীর আদেশনামা নিয়মবিরুদ্ধ এবং বিধি লঙঘনকারী বলে প্রতিভাত হয় এবং বাতিল হয়ে যায়। এর আগে ও অনেকগুলি নীতিবিরুদ্ধে বদলীর আদেশনামা ট্রাইব্যুনালের নির্দেশবলে বাতিল হয় এবং কর্তৃপক্ষ সামরিক ভাবে হলেও পিছু হঠতে বাধ্য হন।

এই পটভূমিতে চলতি আদেশনামাগুলি বের করা হয়। লোকসেবা আয়োগের প্রবিধান সমূহ (রেগুলেশনস্) বিভিন্ন ক্যাডারের নিয়োগবিধি সর্বোপরি সরকারের প্রচলিত কৃত্যক বিধির বিভিন্ন ধারা এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী অনুসৃত নিয়মাবলীকে লঙঘন করে এই আদেশনামাগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে, এর মধ্যে জনগণের পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য যে স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংস করে ফাটকা পুঁজি ও কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আজ্ঞাবাহী কর্পোরেট প্রশাসন গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাই একদিকে যেমন কষ্টার্জিত অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন (ধর্মঘটের অধিকারসহ) কেড়ে নেওয়া হচ্ছে নানা আদেশনামা জারি করে তেমনি আর্থিক দাবি-দাওয়াগুলি চরম পর্বে উপেক্ষিত হচ্ছে। আবার এর বিরুদ্ধে যে লড়াই সংগ্রামগুলি গড়ে উঠছে তাকে আঘাত করার জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে এই সরকার নতুন নতুন নির্দেশ তৈরি করে আক্রমণ শাণিত করছে।

এই আদেশনামাগুলির মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। (ক) একটি নির্দিষ্ট সার্ভিসের/ ক্যাডারের/ পোস্টের কর্মচারীকে অন্য কোনো সার্ভিসে ক্যাডারে বা পোস্টে ফরেন সার্ভিসে বদলী, ডেপুটেশন বা সার্ভিস ইউটিলাইজেশনের জন্য ডিটেলমেন্ট পাঠানো যাবে সৎশ্লিষ্ট সার্ভিস/ ক্যাডার/ পোস্টের কর্মচারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই, যা অযৌক্তিক বেআইনী। (খ) সেক্রেটোরিয়েট ক্যাডারের কর্মচারীদের নিয়োগবিধি অনুযায়ী সেক্রেটোরিয়েটে কাজ করার ন্যায্য ও মেধার ভিত্তিতে অর্জিত সুযোগ খর্ব করা হলো যা তাদের প্রতি চূড়ান্ত প্রবঞ্চনার শামিল। (গ) কর্মচারীদের সম্মতি ছাড়াই ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় উপরিবর্ণিত উপায়ে পাঠানো যাবে। যেন প্রভুর বান্দা হলো কর্মচারীরা। (ঘ) প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কাজের যে ধারা গড়ে উঠেছিল বা যে প্রকরণগুলি ব্যবহার করে সুচারুভাবে প্রশাসন পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অপসৃত হবে যা সমগ্র প্রশাসনে অদ্ভুত অস্থিরতা ও জটিলতার জন্ম দেবে। (ঙ) সেক্রেটারিয়েট কমন ক্যাডার সহ অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদের বদলী, ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্টে পাঠানোর ব্যাপারে কোনো নীতি বা মাপকাঠি (ক্রাইটেরিয়া) স্থির করা হয়নি। ১৭ জানুয়ারির আদেশনামায় (স্মারক নং ৩০৭-এফ পি) যে ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে উভয়ক্ষেত্রের কমন ক্যাডারের কর্মচারীদের বদলী, বা ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্টে পাঠানো হবে 'কেস টু কেসের' ভিত্তিতে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট নীতি বা মাপকাঠির বদলে যেমন খুশী (পিক অ্যান্ড চুজ) পদ্ধতিতে কর্মচারীদের বদলী বা ডেপুটেশন বা ডিটেলমেন্ট করা যাবে। মনে করার কারণ আছে জনস্বার্থে নয় অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করা হবে।

শুধু কি এই আদেশনামাগুলির মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের সন্ত্রস্ত করে তোলা হচ্ছে তা নয়, পূর্ত বিভাগ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ পুনর্গঠনের নামে বিভিন্ন অফিসের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে, নির্বিচারে পরিকাঠামো ছাড়াই দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে। সেচ ও জলপথ বিভাগেও এই ঘটনা ঘটছে। পুনর্গঠিত অফিসগুলির পদ ডেপুটেশন বা অন্য ভাবে পূর্ণ হলে সরবরাহকারী অফিসগুলির সৃষ্ট শূন্য পদগুলি অবলুপ্ত হবে আদেশনামায় জানানো হচ্ছে। এভাবে কার্যত নয়া উদারবাদী অর্থনীতির প্রেসক্রিপশনকেই অনুসরন করা হচ্ছে। ১৫ দিন আগে ছুটির দরখাস্ত করতে হবে, ক্যাজুয়াল লাভের জন্য অনুমতি নিতে হবে। লোকসেবা আয়োগের কাঠামো খর্ব করে পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্থায়ীপদে চুক্তির ভিত্তিতে নির্বিচারে নিয়োগ চলছে। সুপারিশকারীর নাম সমেত তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এক অদ্ভুত আঁধার, নৈরাজ্য রাজ্য প্রশাসনকে গ্রাস করছে। তাই এর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। সমগ্র কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সকল আদেশনামা, রাজ্য সরকারের কালা কানুনগুলির বিরুদ্ধে আগামী দিনে ব্যাপকতম প্রতিবাদ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সদ্য সমাপ্ত সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনও এই আহ্বান জানিয়েছে। □

রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত

কর্মচারী সমিতিগুলির প্রতিবাদ

সম্প্রতি পূর্ত বিভাগের ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ নোটিফিকেশন নং ২৩৬ দ্বারা পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) ও পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) অধিকারের পূনর্গঠনের নামে কয়েকটি সার্কেল, ডিভিশন ও সাব-ডিভিশনের বর্তমান অফিস স্থানের পরিবর্তন করা হচ্ছে। অফিসগুলির স্থান পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি অফিসকে জলপাইগুড়ি থেকে মালদা, কলকাতা থেকে হুগলী ও পুরুলিয়া, হরিণঘাটা (নদীয়া) থেকে মালদা ও বালুরঘাটে (দক্ষিণ দিনাজপুর) স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রদত্ত পত্রে বলা হয়েছে প্রশাসনিক স্বার্থে অফিসগুলির নির্বিচার স্থানান্তরণ সমর্থনযোগ্য নয়। অফিসগুলি পুনর্বিন্যাসের পূর্বে কয়েকটি জরুরী বিষয় সরকারের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

প্রথমত, স্থানান্তরিত গ্রুপ ডি স্তরের কর্মচারীদের স্ব স্ব জেলায় পুনর্বিন্যস্ত অফিস দপ্তরে সুনির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে ফিরে আসার ব্যাপারে একটি নীতিসম্মত মাপকাঠি ঠিক করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অনুরূপ মাপকাঠির ভিত্তিতে মহিলাদেরও স্ব স্ব জেলার অফিস দপ্তরে ফিরে আসার ব্যাপারে সুনিশ্চয়তা ঠিক করা জরুরী।

তৃতীয়ত, জ্যেষ্ঠ কর্মচারী বা যাঁরা অনতিদূর সময়ে অবসর নেবেন তাঁদের স্ব স্ব জেলায় বা যেখানে তিনি বাসস্থান ঠিক করেছেন সেখানে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে সংগঠনগুলির আরও বক্তব্য হল ঐ নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে অফিসগুলির বর্তমান পদগুলি অবসর গ্রহণ বা পদোন্নতির জন্য শূন্য হলে ঐ পদগুলিকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। আশঙ্কা হল এর ফলে উল্লিখিত সার্কেল / ডিভিশন / সাব-ডিভিশনের অন্তত ৪০ শতাংশ পদ অবলুপ্ত হবে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে স্থায়ী কোনো পদ বা পদসমূহকে এই কারণে বাতিল বলে গণ্য করার অন্তর্নিহিত অর্থ হল স্থায়ী পদের সংকোচন এবং প্রশাসনিক কাঠামোর খর্বসাধন। সংগঠনগুলি এর তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং আদেশনামার ঐ অংশটি অতি দ্রুত বাতিল করার দাবি জানিয়েছে।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে জরুরী বিষয়গুলি মন্ত্রিসভা প্রশাসনিক প্রজ্ঞা দিয়ে কর্মচারী সমাজের বাস্তব সমস্যাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং পদ বাতিলের কর্মচারী ও জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তটিকে নোটিফিকেশনের আওতা থেকে প্রত্যাহার করবে। □

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
কলকাতা ও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচী

সারা রাজ্য জুড়ে নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি, ব্যাপক নারী নির্যাতন, বহু সরকারী অর্থের অপব্যয়ে সরকারী দপ্তরগুলির স্থানান্তরণ, নিয়মনীতি-বহির্ভূতভাবে হয়রানিমূলক বদলী এবং সর্বোপরি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক অর্জিত অধিকারগুলি খর্ব করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ০৭-০২-২০১৪ তারিখে টিফিন বিরতিতে কলকাতায় মহাকরণ, নব-মহাকরণ, খাদ্য ভবন, ভবানী ভবন সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে ঐ দিন গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় জেলা সদর, মহকুমা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মচারীরা উপরোক্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

কয়েক হাজার কর্মচারী এই বিক্ষোভ জমায়েতগুলিতে সামিল হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এই বিক্ষোভ সমাবেশগুলিতে বক্তব্য রাখেন। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গিকার গ্রহণ করা হয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলিকে নিয়ে একাধিকবার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তা অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলি পত্র মারফৎ রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে, যদিও কোনও ফল পাওয়া যায় নি। □

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ডেপুটেশন ও সমাবেশ কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগে কর্মরত ১০ সহস্রাধিক কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দশ দফা জরুরী দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ কলকাতার রাণী রাসমনি এভিনিউতে কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার কেন্দ্রীয় জমায়েত ও বিভাগীয় প্রধান সচিবের নিকট ডেপুটেশনের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়েছে। সমাবেশ শুরুর প্রাক্কালে বিভাগীয় প্রধান সচিবের নিকট সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায়ের নেতৃত্বে ৪ জনের এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল ডেপুটেশনে মিলিত হয়। বেলা ১২টায় সমাবেশের শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সমিতির সভাপতি নির্মল পাল ও চার সহ-সভাপতি প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল বসু, গোবিন্দ দাস, ও পশুপতি ভৌমিককে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। শহীদদের উদ্দেশ্যে শোকজ্ঞাপনের পর সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রজত সাহা বিভাগীয় আদেশনামা নং ১০৩৩ তাং ০৩.০৬.২০০৯-এর বেতনক্রম অবনমনের সিদ্ধান্ত সহ কর্মচারী স্বার্থবিরোধী অংশসমূহ বাতিল এবং তদ্‌সাপেক্ষে সমস্ত প্রমোশনযোগ্য শূন্যপদগুলি দ্রুত পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ, ২০০২ পরবর্তীতে শূন্য হওয়া সমস্ত গ্রেড-১ পদগুলি পূরণের আদেশনামা দ্রুত প্রকাশ, অমিতাভ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে গঠিত ওয়ান-ম্যান কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করা সহ ১০-দফা দাবি সনদ উত্থাপন করেন। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায় বিভাগীয় প্রধান সচিবের নিকট ডেপুটেশনের বিষয়সমূহ বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং ১০ দফা দাবিকে গোটা রাজ্য থেকে কর্মচারীরা যেভাবে গণস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সমর্থন করেছেন, তার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, এই কর্মসূচী বানচাল করতে বিভিন্ন জেলায় শাসকদলের সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন সদস্য কর্মীরা। তা সত্ত্বেও এই কর্মসূচীতে তাঁরা শামিল হয়েছেন। সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ উল্লিখিত দাবিসমূহকে সমর্থন এবং সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটিকে এরকম কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের জন্য অভিনন্দন জানান। রাজ্য জুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন তথা কর্মচারী সংগঠনের ওপর আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করা, কর্মচারীর বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সহ ষষ্ঠ পে-কমিশন অবিলম্বে গঠনের জন্য তিনি রাজ্য সরকারের নিকট দাবি জানান। এরপর দাবিসমূহের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হিমাংশু সরকার। ১৯টি জেলা থেকে আগত দুই সহস্রাধিক সদস্য-কর্মী এই সমাবেশে সামিল হয়ে সমাবেশ কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। □

দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির শোভাযাত্রা

রেকর্ড করলো ইউ পি এ

ইউ পি এ-র এক দশকের শাসনকালে যদি কোনো কিছুতে বৃদ্ধি সত্যিই হয়ে থাকে তা হল দুর্নীতি। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এই সময়ে ঘটা দুর্নীতি সংখ্যার দিক থেকে, আর্থিক ক্ষতির পরিমাণের দিক থেকে, সমাজের ওপরতলার সব অংশকে লোভের আঁতাতে জড়িয়ে ফেলার ভয়ঙ্কর সামাজিক প্রবণতার দিক থেকে বিপজ্জনক মাত্রা ধারণ করেছে। সেই বিশাল হিমশৈলের কিছু কিছু অংশ মাঝে মাঝে জনসমক্ষে জেগে উঠে আলোড়ন তৈরী করেছে। তার থেকে কয়েকটি মাত্র আর্থিক কেলেঙ্কারির আলোচনা আমরা করলাম।

বীমা কেলেঙ্কারি ঃ- ৪০০ কোটি টাকারও বেশি জালিয়াতি ধরা পরে ভারতীয় রেলে। ৬৫,০০০ রেল কর্মচারী ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের অধীন একটি সমষ্টি বীমা প্রকল্পের সদস্য হন নর্দার্ন জোন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ অ্যান্ড থ্রিফ্‌ট ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের মাধ্যমে। প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে সংগৃহীত মাসিক ৫০ টাকা হারে প্রিমিয়াম হিসাবে প্রতিমাসে সমবায় সমিতিটি খাতায় কলমে ৩২.৫ লক্ষ টাকা জমা দিলেও সেই টাকা সাইফন হয়ে পকেট ভরিয়েছে রেলের কিছু আমলা, জীবন বীমা নিগমের কর্তাব্যক্তিদের।

কয়লা কেলেঙ্কারি ঃ ২০১২ সালে ক্যাগ রিপোর্টে কয়লাশিল্পে ১৯৪টি খনির নিলামে বেনিয়ম ধরা পড়ে। ২০০৪ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ঐ ১৯৪টি কয়লাখনি নিলাম না করে বন্টন করার সরকারী সিদ্ধান্তে বিপুল পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি হয়। প্রাথমিকভাবে এই ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষ কোটি ধরা হয়েছিল, পরে ক্যাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বাদ দিয়ে এই ক্ষতির পরিমাণ দেখায় ১.৮ লক্ষ কোটি। দেশের সংসদ তোলপাড় হয় এই ঘটনায়। সিবিআই তদন্ত হয়। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে এবিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর জ্ঞাতসারে এই আর্থিক দুর্নীতি ঘটার কথা প্রকাশ্যে আসে। ইউ পি এ সরকারে তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জগন্নাথরক্ষকন, পর্যটন মন্ত্রী সুবোধ কান্ত সহায়, বিজেপির রাজ্য সভার সাংসদ অজয় সাঞ্চেতি, কংগ্রেস সাংসদ বিজয় দারদা ও তার ভাই মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী রাজেন্দ্র দারদা, কংগ্রেস সাংসদ নবীন জিন্দাল সহ দেশের প্রধান দুটি দল এবং তাদের শরিকদের সাংসদ বিধায়কদের নাম জড়িয়ে যায়। দেখা যায় খনিবন্টনের দুর্নীতির পর্বে যারা বিভিন্ন সময়ে কয়লামন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন তার মধ্যে শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০০৪-এর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত) নামও উঠে আসে।

২জি স্পেক্ট্রাম কেলেঙ্কারি ঃ-২০০৮ সালে ১২২টি সেকেন্ড জেনারেশন ইউনিফায়েড অ্যাকসেস সার্ভিস লাইসেন্স দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানিকে। আগে এলে আগে পাওয়ার ভিত্তিতে, ২০০১ সালের বাজারদরের ভিত্তিতে এই লাইসেন্সগুলি দেওয়ায় সরকারের ক্ষতি হয় ৩০ হাজার ৯৮৪ কোটি, বলে সিবিআই চার্জশিট দেয়। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি জনস্বার্থ মামলায় ঐভাবে লাইসেন্স প্রদানকে 'অসাংবিধানিক ও নিয়ম বহির্ভূত' বলে ঘোষণা করে এবং ১২২টি লাইসেন্সকেই বাতিল করতে বলে। এই কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের ভূতপূর্ব মন্ত্রী এ. রাজা (২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মন্ত্রিত্বে ছিলেন), যিনি ইউ পি এ শরিক ও ডি এম কে-র সাংসদ। তিনি কয়েকটি বিশেষ কোম্পানিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য লাইসেন্স-এর জন্য আবেদনের শেষ তারিখ এগিয়ে এনেছিলেন, ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে। ডি এম কে-র রাজ্যসভার সাংসদ কানিমোঝি এ. রাজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিজেপি সাংসদ প্রমোদ মহাজনের নামও জড়িয়ে যায় এই কেলেঙ্কারিতে। ২জন সর্বোচ্চ পদের আমলা, বিভিন্ন কোম্পানির ১৪ জন এক্সিকিউটিভ, ইউনিটেক ওয়্যারলেস্স, রিলায়েন্স টেলিকম, সোয়ান টেলিকম প্রভৃতি কোম্পানি এবং ফিল্ম ও মিডিয়া জগতের কিছু ব্যক্তির নাম জড়িয়ে যায়। এ. রাজাকে যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী করার এবং পরবর্তীতে ২ জি স্পেকট্রাম লাইসেন্স-এর ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে সিবিআই কর্পোরেট লবিইস্ট নীরা রাদিয়ার সঙ্গে রতন টাটা, মুকেশ আম্বানি সহ দেশে বৃহৎ পুঁজিপতিদের এবং মিডিয়ার বিভিন্ন নামী দামীদের দূরভাষ-কথোপকথনের টেপ থেকে। সরকারী মন্ত্রী-সাংসদ আমলা-কর্পোরেট-মিডিয়ার আঁতাতে দেশে কিভাবে দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে এই ঘটনায় তা প্রকাশিত হয়।

চপারগেট কেলেঙ্কারি ঃ- ২০১০ সালে ইতালীয় কোম্পানি অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ডের কাছ থেকে ভি.ভি.আই.পিদের যাতায়াতের জন্য ১২টি হেলিকপ্টার কেনার বরাতের জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর এয়ার চিফ মার্শাল এস. পি. ত্যাগী সহ কয়েকজন আধিকারিক ঘুষ নিয়েছেন ২০১৩ সালে এই অভিযোগ ওঠে। প্রথমে সিবিআই পরে সংসদীয় যৌথ কমিটি তদন্ত শুরু করে। ইতালীর কোর্টে ২০০৮ সালে দেওয়া এক নোটে কোম্পানির পক্ষ থেকে ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, তাঁর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেল, মনমোহন সিং, প্রণব মুখার্জী, অস্কার ফার্নান্ডেজ, বীরাপ্পা মইলি, এম.কে.নারায়ণন প্রভৃতির নাম সহ একটি তালিকা পেশ করা হয় এবং কয়েক দফায় মোট ২৩৪ লক্ষ ইউরো ঘুষ দেওয়া হয়েছে বলা হয়। ২০১৪ জানুয়ারিতে অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ডের সঙ্গে ৩৬ কোটি টাকার চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি ঃ- ২০০২ সালে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে সামরিক বিভাগে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য একটি সমবায় আবাসন সমিতি তৈরীর লক্ষ্যে মুম্বাইতে জমির জন্য আবেদন করা হয়। বছর দশেক বাদে দেখা যায় শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা, আমলা এবং মিলিটারি অফিসাররা বহুক্ষেত্রে নিয়ম লঙঘন করে এখানে গৃহনির্মাণে সাহায্য করেছেন এবং মুম্বাইয়ের এই বিলাসবহুল এলাকায় তারা অনেক কম দামে ফ্ল্যাট পেয়েছেন। ২০১১ সালে ক্যাগের রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়—''আদর্শ সমবায় আবাসন সমিতির ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে কিভাবে বিশেষ বিশেষ আধিকারিকদের একটি গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার সুবাদে মূল্যবান সরকারী সম্পত্তি, জনগণের সম্পত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের জন্য নিয়মনীতি লঙঘন করেছে।'' সিবিআই, আয়কর দপ্তর, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের তদন্তে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকারের তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নাম উঠে আসে। এরা হলেন, সুশীল কুমার শিন্ডে, বিলাসরাও দেশমুখ, অশোক চহ্বান। ১২ জন শীর্ষ আমলার যুক্ত থাকার প্রসঙ্গও জানা যায়। ২০১৩ সালে বিচার বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টে এদের সঙ্গে আরও একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের নামও জড়িয়ে যায়। বলা হয় মোট ১০২ জন বেআইনী সদস্য সমিতিতে আছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে রিপোর্ট ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হয়।

ইউ পি এ-১ সরকারের পতন ঠেকাতে সাংসদদের ঘুষ ঃ ২০০৮ সালে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে ৪টি বামপন্থী দল কেন্দ্রের ইউ পি এ-১ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। সংসদে বিজেপিও সরকার বিরোধী অবস্থান নেওয়ায় এই প্রশ্নে ২২ জুলাই, ২০০৮ সংসদে আস্থা ভোটের প্রয়োজনীয় সংখ্যা অর্জন করা সম্ভব ছিল না সরকারপক্ষের, কিন্তু সরকারপক্ষ ভোটে জেতে। কোনো কোনো বিজেপি সাংসদরা টাকার বান্ডিল এনে সংসদে দেখান যে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ঘুষ দেওয়া হয়েছে। স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জী নয়াদিল্লীর পুলিশ প্রধানকে তদন্তের নির্দেশ দেন। সমাজবাদী পার্টি নেতা অমর সিং এবং কংগ্রেস সাংসদ আহমেদ প্যাটেলের নাম উল্লিখিত হয়। পরে সংসদীয় কমিটি ঘুষকাণ্ডে তাঁদের জড়িত থাকার প্রমাণ নেই বললেও অমর সিংহের সহকারী সঞ্জীব সাক্সেনা, এল কে আদবানীর সহকারী সুধীন্দ্র কুলকার্নি এবং ভারতীয় যুব মোর্চার সোহায়েল হিন্দুস্থানীকে সন্দেহের তালিকায় রাখে। ২০১১ সালে উইকিলিকস-এর প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় ভারতে মার্কিন দূতাবাস এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে ঘুষ দিয়ে আস্থা ভোটে জেতার জন্য ৫০-৬০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করে রাখা আছে। সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদনের সূত্র ধরে সুপ্রিম কোর্ট বারংবার দিল্লী পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদন্ত রিপোর্ট চেয়েও কোনো অগ্রগতি না দেখে ভর্ৎসনা করার পরও প্রকৃত সত্য উদঘাটনে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার কোনো উদ্যোগ নেয় নি, সমস্ত পদ্ধতি বিলম্বিত করেছে। □

পিছিয়ে নেই রাজ্যের শাসকদল

ত্রিফলা ঃ ত্রিফলা আলো বসানোর জেরে তৃণমূলের সততা এখন প্রশ্নের মুখে। রাজ্যের পৌরমন্ত্রী নিজের দায় এড়ালেও কার্যত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, ত্রিফলা আলো নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনে বেনিয়ম হয়েছে।

কর্পোরেশনের নিয়ম হলো, ৫ লক্ষ টাকার বেশি খরচ হলে তার জন্য টেন্ডার বা বরাত ডেকে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে ত্রিফলা আলো বসাতে খরচ হয়েছে ২৭ কোটি টাকা। বরাত দেওয়ার নিয়মকে এড়ানোর জন্য ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৪০টি ফাইল তৈরি করা হয়। দুর্নীতি ও নিজের লোককে বরাত পাইয়ে দেবার জন্য কতই না ফন্দি ফিকির করা যায়। যেমন বিধাননগর পৌরসভায় যে ত্রিফলা আলো বসেছে তার জন্য খরচ হয়েছে আলো প্রতি ১৩ হাজার ৬৫৪ টাকা। অথচ কলকাতা কর্পোরেশন নিম্নমানের ত্রিফলা আলোর জন্য আলো প্রতি ২৬ থেকে ৩০ হাজার টাকা। কলকাতা কর্পোরেশনের নিজস্ব কারখানা থাকা সত্ত্বেও এ কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে বাইরের সংস্থাকে। এখনই কলকাতার রাস্তার বহু জায়গায় ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ কাত হয়ে গেছে, নিভে গেছে। কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্নচিহ্নকে কিছুতেই নেভানো যাচ্ছে না।

তেল কেলেঙ্কারি ঃ এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের গাড়ির তেলের টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। প্রতি মাসে ৫০ লক্ষ টাকা জ্বালানি তেলের খরচের কোনো হিসাব নেই। একই গাড়িতে পেট্রোল এবং ডিজেলের জন্য দু'বার করে খরচ দেখানো হচ্ছে। পুরসভার নথিভুক্ত গাড়ির তালিকায় নেই, এমন গাড়ির জন্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার তেল খরচ দেখানো হয়েছে।

নীল-সাদা রঙ ঃ কলকাতা শহর সাজানোর জন্য (পড়ুন লন্ডন বানানোর জন্য) রাজ্য সরকার এবং কর্পোরেশন সর্বত্র নীল-সাদা রঙ লেপেই চলেছে। এক পশলা বৃষ্টিতেই রঙ ধুয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আবার রঙ, আবার রঙ। তৃণমূল কংগ্রেসেরই এক প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগ ঐসব নীল সাদা রঙ কেনা হয়েছে যে ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সেই ব্যবসায়ী আর কেউ নন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

সততার প্রতীক-সারদা ঃ সুদীপ্ত সেন এবং কুণাল ঘোষের বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট, ''মমতা ব্যানার্জী এবং মুকুল রায়'' সব জানেন। এছাড়াও তৃণমূলের একজন নেতার নাম করেছেন। সবাই জানেন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কেনা থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে সাইকেল এবং অ্যাম্বুলেন্স বিলির কাজে যুক্ত ছিলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন।

অসংখ্য মানুষের (আমানতকারীদের) যন্ত্রণার, কান্নার জবাবে মাননীয়ার উত্তর 'যা গেছে, তা গেছে।' ২০১২ সালের ১০ ডিসেম্বর এই চিটফান্ডের বে-আইনী কার্যকলাপ নিয়ে তদন্তের দাবিতে প্রস্তাব বামপন্থীদের পক্ষ থেকে উত্থাপন করার জন্য সরকার পক্ষের বিধায়করা (পড়ুন তৃণমূলীরা) মহিলা বিধায়ক দেবলীনা হেমব্রম সহ অন্য বিধায়কদের উপর তুমুল হামলা করে। বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী গুরুতরভাবে আহত হন। সারদা-শাসক দলের এই অশুভ আঁতাতের ফলে মূল্য দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকেই। আত্মহত্যার ঢল নেমেছে।

শিশুদের খাবারেও চুরি ঃ জানা গেছে ২০১১ সালে ডিসেম্বরে কর্পোরেশনের গুদামে মিড-ডে মিলের যে পরিমাণ চাল থাকার কথা ২০১২ সালের জানুয়ারিতে তার থেকে ৯ হাজার কুইন্টাল চাল কম পাওয়া গেছে। উধাও চালের মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

টেট কেলেঙ্কারি ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি। মেধাবী পরীক্ষার্থীরা সফল হয়নি, অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের টাকা দেওয়ার বিনিময়ে তুলনায় কম মেধার পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। এমনকি একজন তৃণমূলের বিধায়কের পরিবারের পাঁচ জন পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিমধ্যে দু'-দুবার চেয়ারম্যানকে অপসারিত করেন নতুন চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এসজেডিএ দুর্নীতি ঃ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের শতাধিক কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই পুরানোদের সরিয়ে নতুন বোর্ড তৈরি হয়। একেবারেই তৃণমূলের দলীয় বোর্ড। ই-কোটেশনের নামে টেন্ডার পদ্ধতি বন্ধ করে একের পর এক কাজ দেওয়া শুরু হয়। দলও প্রশাসনের কর্তাদের মদতে কোটি কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ সামান্য অংশ শেষ করে ঠিকাদারদের সম্পূর্ণ অর্থ মিটিয়ে দেয় বোর্ড এবং তদানীন্তন সিইও। বহু জায়গায় কাজই হয়নি অথচ কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকাদারদের। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া হয় বে-আইনি কাজের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। দোষী ব্যক্তিদের (পড়ুন তৃণমূলী নেতৃত্বকে) যাতে গ্রেপ্তার না করতে পারেন তার জন্যই এই অপসারণ। একশো কোটি টাকা নয়ছয়ের এই দুর্নীতিকে ধামাচাপা দেওয়ার পথেই চলেছে রাজ্য সরকার।

গম কেলেঙ্কারি ঃ ২০১১ সালের ১৯ আগস্ট 'রাজ্য বীজ নিগম' দুর্যোগ কবলিত এলাকার মিনিকিট সরবরাহ করার জন্য বীজ কেনার জন্য টেন্ডার দেয়। দু'দিনের মধ্যে বিগত সরকারের টেন্ডার নীতি পরিবর্তন করে নতুন টেন্ডার নীতি ঘোষিত হয়। বলা হল বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার (পুরানো টেন্ডার নীতিতে যা ছিল) সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা সংস্থাও অংশ নিতে পারবে। এই পদ্ধতিতেই নেরাম্যাক নামক সংস্থাকে (পুরানো পদ্ধতিতে যিনি কোনোভাবেই পেতেন না) ২২৫০ মেট্রিকটন গমবীজ, তিলবীজ ও কুলতি কড়াইয়ের সরবরাহের বরাত দেওয়া হয়। কৃষি দপ্তর থেকে ৪০ কেজি বস্তার বদলে ১৫ কেজি প্যাকেট করার কাজ, আইন বহির্ভূতভাবে নির্দেশ আদায় করে নেয়। এই সমস্ত প্যাকেটে গমবীজের বদলে রেশমের গম ভরে সরবরাহ করা হয়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্বীকার করেন অনিয়ম ঘটেছে এবং অভিযোগ প্রামাণিত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন শাসক দলের যে রাঘব বোয়ালরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের কারও শাস্তি হয়নি। উল্টে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকেই কৃষিদপ্তর থেকে সরে যেতে হয়েছে। আর পরবর্তী কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''কোনো দুর্নীতি হয়নি। যা কিছু হয়েছিল সব বামফ্রন্টের আমলে।''

শেষ করছি সততার প্রতীকের পিঠস্থান মহাকরণ থেকেই। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মরতা এক ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলা আরতি সাহা, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ''৫৬,৬০০ টাকা আত্মসাৎ করেছে।'' যে তিনজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আঙুল তোলা হয়েছিল (অমিতাভ মাইতি, সঞ্জীব পাল, অরুণ পাল)। যারা বেআইনি চিট ফাণ্ডের তিন হর্তাকর্তা এবং শাসক দলের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব। সংগঠনটির নাম 'তৃণমূল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।' পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বরং প্রথম দুইজনকে অর্থ দপ্তর থেকে বদলি করে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রাইজ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। প্রথম জন সেকশন অফিসার, পরের জন উচ্চ বিভাগীয় করণিক। ঐ ৪২০নং ধারায় অভিযুক্ত তিন তৃণমূল কর্মচারী নেতৃত্ব বহাল তবিয়তে কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রীর পাশের জায়গায়। বিগত ত্রিশ মাস ধরে স্বঘোষিত ও সততার প্রতীক-এর অন্তর্জলি যাত্রা ক্রমশ শোভাযাত্রার রূপ পাচ্ছে। □

বিজেপি-রও অঙ্গের ভূষণ

ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতি হচ্ছে কংগ্রেস শাসনের অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু বিজেপি যখন দেশ শাসনের দায়িত্বে ছিল তখন অতি দ্রুত কংগ্রেসের সেই রেকর্ড ছাড়িয়েছিল। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি পুনরায় দিল্লীর মসনদ দখলের লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার করে প্রচার তীব্র করেছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাদের সরকারের দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির খতিয়ান অফুরন্ত। এই স্বল্প পরিসরে বিশদে যাওয়া না গেলেও একনজরে যা দেখা যায়—

● দূরদর্শন কেলেঙ্কারি ও প্রমোদ মহাজনের কীর্তি

বাজপেয়ী সরকারের আমলে অন্যান্য মহাজনেরা যেমন এক এক করে দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে সে পথেই এগিয়ে গেছে অটল ঘনিষ্ঠ প্রমোদ মহাজন, তাঁর স্ত্রী রেখা ও পুত্র রাহুল মহাজনও। মহাজন পরিবার দূরদর্শনের সাড়ে ছয় কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। এই তথ্য ফাঁস করেন প্রমোদ বিরোধী অরুণ জেটলি। অভিযোগ আসলে প্রমোদ মহাজন ও ইন্টিগ্রাল প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেডকে ঘিরে। এই কোম্পানির সাথে গোপন বোঝাপড়া করে প্রসার ভারতীর মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসার রাজীব রতন

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেট (২০১৪-১৫)

পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়া উদারবাদী অর্থনীতির চিত্রপট

স্বাধীনতার পর বার্ষিক সাধারণ বাজেট (পূর্ণাঙ্গ) ৬৬টি, অন্তর্বর্তী বাজেট ১৩টি এবং বিশেষ বাজেট ৪টি নিয়ে মোট ৮৩তম বাজেট লোকসভায় পেশ হলো ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম আগামী (২০১৪-১৫) আর্থিক বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ বা বাজেট পেশ করেন। পি চিদাম্বরমের এটি নবম বাজেট পেশ লোকসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে। উল্লেখ্য, সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী সম্ভাব্য লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ইউপিএ-২ সরকারের পক্ষ থেকে আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত 'ব্যয়ের অধিকার দাবি সমন্বিত' (ভোট-অন এ্যাকাউন্ট) প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। অবশ্য তার আগে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ লোকসভায় চার মাসের জন্য প্রযোজ্য অন্তর্বর্তী রেল বাজেট পেশ করেন এই সরকারের ৬ নং রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খাড়গে।

রেল এখনও লাভজনক সংস্থা। অথচ বাজারের চাহিদা ভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থায় রেলকে রূপান্তরিত করার বহুদিনের লক্ষ্য কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের। স্বভাবতই সরকার তার সংস্কার কর্মসূচি বহাল রাখার বার্তা দিয়েছে অন্তর্বর্তী রেল বাজেটে। খরচ সামলাতে বিদেশি অর্থের সরাসরি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে এই রেল বাজেটে এবং রাজ্যের সঙ্গে অংশীদারিত্বের কথাও ঘোষিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার দোসর হওয়ার পথ থেকে সরতে রাজি না হওয়ার, আবার আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে বাজেট পেশের বকলমে বিগত সময়কালের সাফল্যের ফিরিস্তি সম্বলিত বাজেট নামক নির্বাচনী ইশতেহার প্রচারণার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে অর্থমন্ত্রী সরকারের শেষ বাজেট তথা আর্থিক নীতি পেশ করলেন। প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত আর্থিক নীতিকে আড়াল করতে।

অশোক চক্রবর্তী

॥ অন্তর্বর্তীকালীন রেল বাজেট ॥

ভোট বড় বালাই। তাই ভোটযন্ত্রের বোতাম টিপবে যে জনতা তাদের এই মুহূর্তে চটাতে রাজি নয় সরকার। এই জনতা সরাসরি যে আঘাতটি নিয়ে বিগড়ে যায় তা হলো যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল বৃদ্ধির আঘাত। আঘাত করার সুযোগ আসবে ভোটপর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর। তাই সেটা আপাতত তুলে রাখা হলো। বাড়লো না যাত্রী ভাড়া, বাড়লো না পণ্য মাশুল।

তৃণমূল কংগ্রেস দলের রেলমন্ত্রী দীনেশ দ্বিবেদী, যিনি তৃণমূল নেত্রীর কোপে পড়ে পদত্যাগ করেন, তাঁরই দেখানো পথে রেলওয়ে ট্যারিফ অথরিটি (আরটিএ) অর্থাৎ স্বনির্ভর রেলমাশুল নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠনের ঘোষণা করলেন এই বাজেটে বর্তমান রেলমন্ত্রী। এর ফলে মাশুল বৃদ্ধি বা ভাড়া নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সরকার তার হাত ধুয়ে ফেলার রাস্তাটি পরিষ্কার করে নিল, যেহেতু এখন থেকে এই বিষয়ে সর্বেসর্বার ভূমিকা পালন করবে এই কর্তৃপক্ষ। কর্পোরেট স্বার্থ অনুযায়ী ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি ঘটবে। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন রেল বাজেটে যে যাত্রী ভাড়া কমানো যায় তাও দেখা গিয়েছিল ২০০৯-র বাজেটে। লালুপ্রসাদ যাদব রেলমন্ত্রী হিসাবে সেই বাজেটে সবশ্রেণীর যাত্রীভাড়া ২ শতাংশ হারে কমিয়ে দিয়েছিলেন।

রেল বাজেটে আরও একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। গত বছর বাজেটে যাত্রীভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৪২,২১০ কোটি টাকা, কিন্তু এ বাবদ আয় হয়েছে ৩৭,৫০০ কোটি টাকা, ৪৭১০ কোটি টাকা আনুমানিক কম হবে চলতি আর্থিক বছরে। এর সবটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণহীন অংশের ভাড়া বাবদ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাবদ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২,১০৪ কোটি টাকা, কিন্তু চলতি আর্থিক বছরে আয় হবে ২৬,৩২৪ কোটি টাকা। এর পেছনের কারণকে অস্বীকার করতে পারছেন না রেলের আধিকারিকরা, তাঁরা বলছেন ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবরে ভাড়া বৃদ্ধি যেমন কারণ, তেমনিই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকা থেকে শিল্পাঞ্চল বা শহরতলীতে মানুষ যাত্রা কমিয়েছে, যার পেছনে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে তীব্র আর্থিক অধোগতি। এ বক্তব্যের মধ্যেই ধরা পড়ছে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ফাঁপানো গল্পকথা।

বর্তমান রেলমন্ত্রী পণ্যমাশুল বাবদ আয় বৃদ্ধির গল্প শুনিয়েছেন রেল বাজেটে। বলেছেন চলতি আর্থিক বছরে ৯৪,০০০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা ছাপিয়ে ৪৪৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে ১,০৪৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৪.৯৭ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) টন পণ্য পরিবহন করবে রেল। কিন্তু যেটা বলেননি তা হলো দফায় দফায় ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ট্রাক পরিবহন মাধ্যমটিকে আঘাত করার কেন্দ্রীয় নীতির কারণেই রেল এই ফায়দা তুলেছে তার ঘরে।

আর টিএ-র মাধ্যমেই বেসরকারীকরণের পথে হাঁটবে রেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতার আগে ৪৭টি নেটওয়ার্কের একটি ক্লাস্টার বা গুচ্ছে ৩২টি বেসরকারী সংস্থা ছিল। সেগুলিরই জাতীয়করণ করে জাতীয় সম্পদ হিসাবে ভারতীয় রেল গড়ে উঠেছিল।

রেলমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন—ভারতীয় রেল প্রাথমিকভাবে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন। যে কথার মর্মার্থ হচ্ছে রেলকে পরিষেবামূলক সংস্থার বদলে বাজারের চাহিদাভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তরিত করা দরকার। রেলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের কথা রেলমন্ত্রী বলেছেন। উল্লেখ্য বাণিজ্য মন্ত্রক চাইছে রেল চলাচল ও পরিকাঠামোয় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ। এর আগেকার রেল বাজেটগুলিতেই যৌথ উদ্যোগ তথা পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলের অনুমোদন মারফৎ বেসরকারি সংস্থার প্রবেশের পথ পরিষ্কার করা হয়েই আছে, এখন চাইছে ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ। রেল চলাচলের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। যদিও ১৯৫১ সালের শিল্প আইন অনুযায়ী রেলে বিদেশি বিনিয়োগ করা যায় না। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

রেল বাজেট মানেই রেলমন্ত্রীদের কোলে ঝোল টানা। রাজনৈতিক স্বার্থে রেলকে ব্যবহার করার ন্যক্কারজনক পন্থা অবলম্বনের নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন তৃণমূলের তিন রেলমন্ত্রী। রাজনৈতিক স্বার্থে রেলকে ব্যক্তি সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। বিশেষত তৃণমূল নেত্রী পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা ও শিলান্যাস করেছিলেন, যা ছিল চটকদারি লোক দেখানো সক্রিয়তা। এর পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। এবারের অন্তর্বর্তী রেল বাজেটে তৃণমূলের তিন রেলমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিগুলির পাত্তাই পাওয়া গেল না।

প্রস্তাবিত রেল বাজেটে কলকাতা ও শহরতলীতে মেট্রোরেলের প্রকল্পগুলি নিয়ে বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনোও উল্লেখ না থাকায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের পারস্পরিক কাজিয়ায় বঞ্চনার সঙ্গে রাজ্য সরকারের অস্বচ্ছ জমিনীতির বিষয়টি সামনে এসে গেছে। এই প্রশ্নে রেল বাজেট তৃণমূল কংগ্রেসের সৃষ্ট জমিজট তৈরির নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে কীভাবে জনস্বার্থবাহী কাজে বাগড়া দেয় সেই চিত্রও বেরিয়ে আসছে। তৃণমূলের বঞ্চনার দাবির প্রত্যুত্তরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রেলমন্ত্রকে রেল প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর দাবি অন্তর্বর্তী রেল বাজেটের ইতিহাসে রেকর্ড তাঁর, কারণ এই বাজেটে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে ১২টি নতুন ট্রেন। অবশ্য রেলমন্ত্রীও তৃণমূল কংগ্রেসকে চিমটি কাটতে ছাড়েননি।

তৃণমূল নেত্রীর রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১১ সালে ৩৮৫ কোটি টাকার ঘাটতিকে কৌশলে উল্লেখ করে রেলের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রীর মাত্র তিন মাসের

রেলমন্ত্রীত্বের সময়কালে শুধুমাত্র শিলান্যাসের বিজ্ঞাপনেই খরচ করেন ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে গায়ক-গায়িকা, চিত্রকরদের রেলের বিভিন্ন কমিটিতে পদ পাইয়ে দিয়ে বেতন ভাতা প্রদান, খানাপিনা, আমোদ-আহ্লাদের খরচ তো আছেই।

রেল বাজেট মানে নতুন নামের নতুন ট্রেন। এবারেও তাই নতুন ট্রেনের নাম 'প্রিমিয়াম' ট্রেন। এই ট্রেনের ভাড়া নির্দিষ্ট নয়। একটি মূল ভাড়া থাকবে সাধারণ ট্রেনের তৎকাল ভাড়ার সমতুল। টিকিটের চাহিদা বাড়তে থাকলে ভাড়াও বাড়তে থাকবে। বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে তুলনীয় এই ব্যবস্থা। টিকিট সংরক্ষণের সময়সীমা ১৫ দিন, কোনো ওয়েটিং লিস্ট হবে না, টিকিট বাতিল করা যাবে না, রিফান্ড পাওয়া যাবে না। বড়লোকেদের ট্রেন, বিমানের ভাড়া দিয়ে ট্রেনে চড়া, সাধারণ মানুষের চড়ার জন্য নয়—এককথায় বেল পাকলে কাকের কী?

রেলের মূল জায়গা নিরাপত্তা, তা নিয়ে বাজেটে কিছু বলা হয়নি। উপার্জন বাড়ানোর উপায়, পুরোনো লাইন ঠিক করা , পণ্য পরিবহন বাড়ানোর ব্যবস্থার মতো কিছুই বলা হয়নি এই বাজেটে।

২০১৩-১৪-তে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ (যোজনা বরাদ্দ) ছিল ৬৩,৩৬৩ কোটি টাকা। কিন্তু আয় ও খরচের ধারা বিবেচনা করে পরিকল্পনা খাতে তা কমিয়ে সংশোধিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৯,৩৫৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ সালে পরিকল্পনা খাতে তা কমিয়ে বরাদ্দ ৬০,১০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে একইভাবে ৫২,২৬৫ কোটি টাকা করা হয়েছিল। পরপর দু'বছর মিলে যদি পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ১২,০০০ কোটি টাকা কমানো হয়, তাহলে সেটা কি ভারতীয় রেলওয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী? অথচ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্যানেস্তারা পেটানোর কাজটা সমানেই চালানো হচ্ছে।

রেল স্টেশনগুলিতে রেলের ঝকঝকে বিজ্ঞাপনের প্রচার—আমাদের (রেলের) উদ্দেশ্য (আওয়ার মটো...)—'নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা'। এই ন্যূনতম পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থাপত্র হিসাবে কি এই বাজেটকে ধরা যাবে? উত্তর একটাই—না, মোটেই না। এ হলো ভোটের আগে লোক দেখানো অন্তঃসারশূন্য বাজেট।

॥ অন্তর্বর্তীকালীন বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ ॥

বাজেট মানে নতুন একটা শ্লোগানের জন্মের সময়। পি. চিদাম্বরম ২০১৪-১৫ সালের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করতে গিয়ে এবারে সেইরকম একটি শ্লোগানকে হাজির করলেন, বললেন এ হলো—'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া'। কেমন সে 'আইডিয়া'? সে 'আইডিয়া' হলো—বিশ্বমন্দায় চলা খোলাবাজারের অর্থনীতিকে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ভাষার মারপ্যাঁচ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বজনীন পথ দেখাবার নামে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকার চাতুরি প্রদর্শন।

কর্পোরেট বন্ধু সরকার, তাই করছাড়ের মাধ্যমে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেওয়ার গতানুগতিক পথেই হেঁটেছেন চিদাম্বরম। মূল্যবৃদ্ধি বা কর্মসংস্থানের প্রশ্নে দিশা দেখাতে পারলেন না। পরন্তু ভর্তুকি কমালেন কৃষি, খাদ্যসহ একাধিক সামাজিক ক্ষেত্রে। এ হলো সংস্কার কর্মসূচীকে একবগ্গা হিসাবে জাপটে ধরে চলার নমুনা।

তবু ভোট বড় বালাই। এই একবগ্গামির কি ফল হতে পারে তার হাতে গরম নমুনা পেয়েছে সদ্য অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে। তাই আম জনতার রোষানল কমাতে কিছু গার্হস্থ্য সাজসরঞ্জাম ও দু'চাকা-চারচাকার দাম কমিয়েছেন। ভাবখানা এমনই যেন এতেই কেল্লা ফতে—ই ভি এম মেশিনের 'হাত' চিহ্নেই কেবলমাত্র বোতাম টিপবে মানুষ।

পৃথিবীর তৃতীয় আর্থিক শক্তির দেশ হিসাবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অষ্টতর শত নামের মতো 'দশ দফা' কর্মসূচীর নিদান হেঁকেছেন।

বিরোধী পক্ষের সমালোচকদের বক্তব্য—'অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট' পেশ করার নামে 'পূর্ণাঙ্গ বাজেট'-ই পেশ করেছেন, গত দশ বছরে সরকার কি কাজ করেছে সেই সাফল্যের রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরেছেন, তাই এটা আর বাজেট নথি থাকেনি, হয়ে গেছে নির্বাচনী ইশতেহার। তাঁদের আরও বক্তব্য এমন বেহাল অর্থনীতি এই সরকার ফেলে যাচ্ছে আগামীদিনের জন্য যা সামাল দেওয়া আগামী সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য। এ হলো নিজে মরার আগে অপরকে মেরে যাওয়ার কৌশল। লক্ষণ স্পষ্ট—আগামীবার এই সরকার আর ফিরে আসবে না।

এই বাজেট বক্তৃতায় চিদাম্বরম জানিয়েছেন ২০১৩-১৪-তে আর্থিক ঘাটতি হওয়ার কথা জিডিপির ৪.৬ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫-তে ৪.১ শতাংশ। কিন্তু কীভাবে আর্থিক ঘাটতিকে ৪.১ শতাংশে বেঁধে রাখা যাবে? বর্তমান মূল্যের নিরিখে আমাদের জিডিপি (নমিনাল) ১৩.৪ শতাংশ। কর আদায়ের বৃদ্ধি ১৯ শতাংশ এবং বিলগ্নী খাতে আয় ৩৭০০০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে নতুন কয়েকটি প্রকল্পে ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে বেশি করে পুঁজি ঢালার চেষ্টা আছে। সুতরাং এরপরে আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের কী পন্থা অবলম্বন করা হবে তা স্পষ্ট করে বলেননি চিদাম্বরম। কর আদায় করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৯৭,৫৫৪ কোটি টাকা, সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা করা হয় ১,৭৯,৫৩৮ কোটি টাকা, ৯.১ শতাংশ কম। কর আদায় কমার কারণ দেশের আর্থিক বৃদ্ধির গতি হ্রাসের পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষত কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের ব্যাপক ধস। এমনকি চলতি অর্থবর্ষে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম কর আদায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১১ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা সার্বিক কর আদায় হতে পারে। সুতরাং আর্থিক ঘাটতি ৪.১ শতাংশ না হয়ে সেই ৪.৮ শতাংশেই পৌঁছাবে।

আর্থিক সংহতিকরণের বড়াই করেছেন চিদাম্বরম। কিন্তু সংহতিকরণের পেছনে যা কাজ করেছে তা উহ্য রেখেছেন। তা হলো ২-জি স্পেকট্রাম নিলাম বাবদ ১৮,০০০ কোটি টাকা এবং বিলগ্নীকরণ ও কোষাগারে জমা পড়া ডিভিডেন্ড বাবদ ৫৫,০০০ কোটি টাকার বিষয়টি। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক ভর্তুকি ছাঁটাই, পরিকল্পনা খাতের বরাদ্দ ছাঁটাই। চলতি আর্থিক বছরে ২০১৩-১৪তে অনুমিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষেত্রে ছাঁটাই করা হয়েছে। পানীয় জল ও শৌচালয় নির্মাণের দপ্তরে ২১.৩ শতাংশ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ২০.৬ শতাংশ, আবাসন ও দারিদ্র্যদূরীকরণ দপ্তরে ৪১.৯৭ শতাংশ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ৩১.৩ শতাংশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে ৬ শতাংশ, সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক দপ্তরে ১৮.৭২ শতাংশ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরে ২২.৯২ শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে। রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ ১,৩৬,২৫৪ কোটি টাকা কমিয়ে ১,১৯,০৩৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়, যা হলো ১২.৬ শতাংশ কম। কেবলমাত্র অর্থ দপ্তরের বরাদ্দ ১৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। এভাবেই সামাজিক এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত দপ্তরগুলি থেকে মূলধনী সম্পদ সৃষ্টিতে অনুদান দেওয়া বন্ধ করে সরকার টাকা বাঁচিয়েছে। এভাবেই মাছের তেলে মাছ ভেজে পাকা রাঁধুনি হওয়ার গল্প ফেঁদেছেন অর্থমন্ত্রী।

সমগ্র অর্থনীতি প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করেছে বলে দাবি করেছেন চিদাম্বরম। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলে। কি সেই পদক্ষেপ? তা হলো চিনির বিনিয়ন্ত্রণ, ডিজেল মূল্যস্তরের সংশোধন (মাসে মাসে দামবৃদ্ধি), পেট্রোলের বিনিয়ন্ত্রণ, রেলভাড়ার সংশোধন (যাত্রীভাড়া, পণ্যমাশুল বৃদ্ধি), ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিস্তৃতি (ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধন করে বিদেশী-বেসরকারী ব্যাঙ্কের অনুপ্রবেশ ঘটানো) ইত্যাদি। এ হলো নিজেদের কাজের সমর্থনে সাফাই গাইতে গিয়ে দেশ ও দশের স্বার্থের বিনিময়ে কৃতকর্মের ওপর রাবার স্ট্যাম্প লাগানো।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, একটু পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। তবে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (জিডিপি) বাড়বে। ২০১৪-১৫-তে জিডিপি-র বৃদ্ধি ঘটবে ১৩.৪ শতাংশ। অথচ পরের বছর মূল্যসূচক অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হার হবে ৬ শতাংশ, প্রসঙ্গত তাই প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার হবে ৭ শতাংশের একটু বেশি। সর্বোপরি, মূলধনী সম্পদ সৃষ্টির জন্য বরাদ্দ এবং মূলধনী ব্যয় ৯১,০০০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে যার পরিণতিতে ০.৮ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ঢক্কানিনাদের অসারত্ব এভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে।

খাদ্য, সার এবং জ্বালানিতে ২০১৪-১৫তে ভর্তুকি বাবদ যথাক্রমে ১,১৫,০০০ কোটি টাকা, ৬৭,৯৭০ কোটি টাকা ও ৬৫,০০০

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

অন্তর্বর্তী বাজেট

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০১৩-১৪তে সমস্ত রকমের খাদ্য প্রকল্পের যুক্ত ব্যয় বরাদ্দ বাবদ ১,২৪,৮৪৪ কোটি টাকার বদলে ১,১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় কার্যত তা পূর্ব ঘোষণার তুলনায় কমই হলো। ইতিমধ্যে সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেই রেখেছে, যা ইউরিয়া সার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। ফলে এই সার উৎপাদনে খরচ বাড়বে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা। সার শিল্পের বক্তব্য হচ্ছে এই ভর্তুকি হওয়া উচিত ছিলো ১.০৭ লক্ষ কোটি টাকা।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ২০১২-১৩তে বরাদ্দ ছিল ৮২,০০০ কোটি টাকা, অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে দেওয়া হয়েছে ৭,৬১৪ কোটি টাকা, রেগা প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনার মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচীর ভাগ্য কি হতে পারে এর ফলে তা সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ্য, গত আর্থিক বছরে শুধুমাত্র রেগা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০,০০০ কোটি টাকা।

চলতি আর্থিক বছরে বিদ্যালয় শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে যেখানে ব্যয় হয়েছিল ৫০,০০০ কোটি টাকা, সেখানে মাত্র এবারের বাড়তি বরাদ্দ ৬,০০০ কোটি টাকা। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরে গত বছরের ১৯,০০০ কোটির জায়গায় এবার বাড়তি বরাদ্দ ৬৫০ কোটি টাকা।

মধ্যবিত্তদের খুশী করতে দু'চাকা, চার চাকা গাড়ির দাম কমানোর ব্যবস্থা করেছেন শুল্ক ছাড় দিয়ে। এস ইউ ভি (স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেল)-র শুল্ক গত বছর ২৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছিল, এবারে তা করা হলো ২৪ শতাংশ। শুল্ক কমানোয় গাড়ি বিক্রি বাড়বে, ফলে গাড়ি শিল্পের মুনাফা বাড়বে। তাই এই ঘোষণা যত না মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশি গাড়ি শিল্পের সংগঠন 'সিয়াম'-এর (সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স) দীর্ঘ দিনের চাপকে মেনে নেওয়া।

কিছু বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের এবং ভোগ্যপণ্যের দাম কমিয়ে মধ্যবিত্ত অংশকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বলেছেন, দেশে তৈরি মোবাইল ফোনের দাম কমবে। এজন্য উৎপাদন কর কমিয়েছেন ৬ শতাংশ। দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে আকছারভাবে ২০০০ টাকার নিচের মোবাইল, এ ধরনের সেটে কর ছিল ২ শতাংশ, এখন ৬ শতাংশ হবে এগুলির ক্ষেত্রে, তাহলে দাম কমবে না বরং বাড়বে। এছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অর্থাৎ 'সেজ'-এ উৎপাদিত পণ্যকে আমদানি হিসাবেই ধরা হয়। নোকিয়া ও স্যামসাঙ তাদের সেট তৈরি করে এই অঞ্চলে, যা আমদানির পর্যায়ে পড়বে, দেশে উৎপাদিত হিসাবে গণ্য হবে না। তাহলে দাম কমবে কীভাবে? এরকম অনেক গোঁজামিলের হিসাব নিয়েই এই বাজেট।

সংস্কার কর্মসূচীর পথ ছাড়তে রাজি নন অর্থমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যে বিলগ্নীকরণের কাজ চলবে। গত বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ হাজার কোটি টাকা, এবারে লক্ষ্যমাত্রা ৩৬,৯২৫ কোটি টাকা। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমদানি করা যন্ত্র বা চুল্লির ওপর শুল্ক কমিয়েছেন বিদেশি সংস্থাগুলি যাতে কম দামে পরমাণু চুল্লির জন্য সামগ্রী সরবরাহ করতে পারে। এ হলো সাগর পারের মুরুব্বিদের খুশী করার প্রচেষ্টা।

গতবছর 'নির্ভয়া' তহবিলের নামে নারীদের নিরাপত্তার জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। এবারেও পরিমাণটা একই রেখে দিয়েছেন এক হাজার কোটি টাকায়। কিন্তু গত বছরের টাকা এখনও সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়নি, তাই একে 'নন-ল্যাপ্সেবেল' তহবিল করার ঘোষণা করেছেন।

পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য শিক্ষা ঋণে সুদের হারে মোরাটোরিয়াম দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। ফৌজিদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন' দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নিয়েছেন। প্রতিরক্ষা খাতে বৃদ্ধি করেছেন ১০ শতাংশ।

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত আদায় না হওয়া করের অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে ৫.১০ লক্ষ কোটি টাকায়। অথচ এই বিপুল অনাদায়ী কর নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি চিদাম্বরম। প্রত্যক্ষ করকে স্পর্শ না করে ধনী ও কর্পোরেট মহলকে স্বস্তি দিয়েছেন। কর্পোরেট হাউসগুলির কর ছাড়ের কোনো তালিকা প্রকাশ করেননি। এসব টাকাকে সরকার দেশের টাকা এবং জনগণের টাকা মনে করলে বাজেটে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতো। এ ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে দেশের নিজস্ব সম্পদ বলে কিছু রাখা হচ্ছে না। একই সঙ্গে আয়করের হার না কমিয়ে বা আয়কর ছাড়ের ঊর্দ্ধসীমা না বাড়িয়ে মধ্যবিত্ত ও চাকুরীজীবীদের হতাশ করেছেন।

এ রাজ্যের বুকে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আছে যেমন যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাতীয় গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, ফরাক্কা ব্যারেজ এদের জন্যও বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে।

বরাদ্দ কম বা বেশি যাই হোক না কেন তার ওপর টাকার মূল্যমান যে প্রভাব ফেলবে তা তো অস্বীকার করার নয়। চিদাম্বরম যখন বাজেট পেশ করছেন তখন টাকার মূল্যমান এক মার্কিন ডলার প্রতি ৬১.৯৩ টাকা, যদিও বাজেট বক্তৃতার শেষে তা দাঁড়ায় ৬১.৮৫ টাকা। এই বিষয়টাকেও বরাদ্দের অংশ নিয়ে হিসেব করার সময় বিবেচনায় যেমন রাখতে হবে তেমনই মুদ্রাস্ফীতিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

।। শেষের কথা।।

দেশের অর্থনীতি যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সেগুলি সম্পর্কে নীরব থেকেছে এই বাজেট। চাকরি ছাঁটাই, নতুন কর্মসংস্থান নিয়ে, অসংগঠিত শিল্প ও শ্রমিকদের নিয়ে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে, অর্থনৈতিক মন্দা নিরসনের পন্থা নিয়ে কোনো কথা নেই বাজেটে। কথা নেই সর্বগ্রাসী দুর্নীতি নিয়ে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পরিবর্তে বিদেশি পুঁজির ওপর নির্ভরশীলতার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী।

সর্বক্ষেত্রে বরাদ্দ যখন বৃদ্ধি প্রয়োজন তখন তা কমানো হয়েছে, পরিণতিতে অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকট আরো বাড়বে। আর্থিক সুসংহতির নামে জনস্বার্থের ভর্তুকি ছাঁটাই করে মানুষের চাহিদাগুলিকে নস্যাৎ করা হয়েছে। দারিদ্র্য সীমার ওপরে ১৪ কোটি মানুষকে তোলার দাবি বাস্তব বাজার দরের নিরিখে প্রহসন মাত্র।

গোটা বিশ্বে যখন নয়া উদারবাদী পথ মুখ থুবড়ে পড়ছে, তখন আমাদের দেশের সরকার মানুষের ঘাড়ে সেই পথকেই বেশি বেশি করে চাপিয়ে দিতে চাইছে। বর্তমান বাজেটে সেটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

স্বভাবতই এই জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা দরকার। সেকাজে এখনই আমাদের নেমে পড়তে হবে। □

বিজেপির দুর্নীতি

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

শাহ-র সহযোগিতায় প্রসার ভারতীর প্রাপ্যও টাকা না দিয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে মহাজন পরিবার।

● মরিশাস কাণ্ড ঃ কর ছাড় কেলেঙ্কারি

মরিশাস কাণ্ডেও ফেঁসে যান তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা। এক শ্রেণীর বিদেশী অর্থলগ্নী সংস্থা ভারতের শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে বিপুল মুনাফা করা সত্ত্বেও ভারতে কোন কর দিচ্ছিল না। এদেশের শেয়ার বাজারে বিদেশী লগ্নিকারীদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীকে কর ছাড় করে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে এদেশের বিরাট ক্ষতি করেছে যশবন্ত সিনহা। ক্ষতির পরিমাণ বছরে তিন হাজার কোটি টাকা। এমনকি অভিযোগ ওঠামাত্র প্রকাশ্যেই ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সওয়াল করেন যশবন্ত সিনহা। আয়কর দপ্তর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলেও তিনি আয়কর দপ্তরের তদন্তের কাজে বাধা সৃষ্টি করে তদন্ত বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

● তেহলকা কেলেঙ্কারি ঃ তদন্তের নামে প্রহসন

খুবই উল্লেখযোগ্য কেলেঙ্কারি এটি, নিশ্চয় সকলের মনে আছে। ঘুষ খেয়ে আর মুখ দেখাতে পারছিল না তৎকালীন শাসক জোটের তাবড় তাবড় নেতা সহ জনাকয়েক অফিসার। তেহলকা সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা নিজেরাই অস্ত্র বিক্রেতা সেজে তাদের ঘুষ দিয়েছিলেন, যা গোপন ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা সবাই দেখেছি। নিজের বাড়িতে বসে খোদ বিজেপি সভাপতি কিভাবে টাকা নিচ্ছেন। জর্জ ফার্নান্ডেজের বাড়িতে বসে সমতা পার্টির সভানেত্রী জয়া, জেটলি কিভাবে দু-হাত বাড়িয়ে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন—লজ্জার বালাই না রেখে। সেই ছবির মাধ্যমে সারা দেশ দেখেছে রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শারদ যাদব, এমনকি টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ানও কিভাবে উৎকোচ নিয়েছেন।

● টেলিকম কেলেঙ্কারি

প্রাইভেট সেলুলার অপারেটরদের লাইসেন্স ফি মকুবে তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রী জগমোহন আপত্তি জানানোয়, তাঁকে সরিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী সেই অপারেটরদের লাইসেন্স ফি মকুব করে দেন। এর ফলে দেশের মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪৬,০০০ কোটি টাকা।

● চিনি কেলেঙ্কারি

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস, তখন দেশে চিনির কোন ঘাটতি ছিল না। দেশে চিনির উৎপাদন ছিল ১৫৪ লক্ষ টন ও ব্যবহার ছিল ১৪৬ লক্ষ টন, অর্থাৎ ৮ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও বাজপেয়ী সরকার পাকিস্তান থেকে ৫.৫৪ লক্ষ টন চিনি আমদানি করে। তার ফলে দেশের ক্ষতি হয় ৯০০ কোটি টাকা।

● ইউটিআই কেলেঙ্কারি

বিজেপি জোট সরকারের লোভ ও দুর্নীতির শিকার হলো ১৯৬৩ সালে স্থাপিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইউটিআই। সংস্থার কিছু কর্তাব্যক্তি ও সরকারে যোগসাজসে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা উপার্জিত কোটি কোটি টাকা অখ্যাত-অনামী সংস্থায় লগ্নী করে নয়-ছয় করেছিল। এই সরকারের হাতে পড়েই মানুষের আস্থা হারালো এতদিনের বিশ্বস্ত 'ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া'।

● জমি কেলেঙ্কারি

দলিত ও অন্যান্য দুর্বলতর মানুষের প্রাপ্য জমি আত্মসাৎ করেছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু। নেল্লোর জেলার ভেঙ্কটচলম অঞ্চলের কাসুমুরুতে ৪০.১৫ একর উর্বর ও মূল্যবান কৃষিজমি তার শ্যালক আল্লুট বাস্কাইরাইয়ার নামে, শ্বশুর চিনা মস্তানহিয়ার নামে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভূমিহীন কৃষক হিসাবে দেখিয়ে সরকারী দপ্তর থেকে পাট্টা বের করে আত্মসাৎ করেছে এবং এর সবটাই জমির উর্ধ্বসীমা আইনকে ফাঁকি দিয়ে। এর ফলে দেশের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

● পেট্রোলপাম্প ও অন্যান্য কেলেঙ্কারি

পেট্রোলপাম্প, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি বিষয়েও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি জোট সরকার। যে দুর্নীতির পরিমাণ ২৫০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ২০ জন বিজেপি সাংসদ ও জোটের ১০০ জন বিধায়ক সহ বাজপেয়ীর ভাগ্নে-বউও জড়িয়ে পড়েন এই কেলেঙ্কারিতে। এছাড়াও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কফিন কেলেঙ্কারি, হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এত দুর্নীতি কেলেঙ্কারির বোঝা যাদের ঘাড়ে তারাই আবার তাদের অতীব সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে রেখে আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছে। আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা একসময়ে তাদেরই জোটসঙ্গী বর্তমানে প্রচ্ছন্নভাবে তাদের সাথে আবার জোটের হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। গত তিন বছরে এই রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতিরও তো সীমা নেই। □ **শাশ্বতী মজুমদার, কুমকুম মিত্র ও প্রিয়ব্রত ভৌমিক**

শোক সংবাদ

কমরেড উৎপল সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সভাপতি কমরেড উৎপল সেনগুপ্ত গত ২৬ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে গেছেন। ১৯৯৭ সালে চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি পেনশনার্স সমিতির সাথে যুক্ত হন। কর্মরত অবস্থায় তিনি স্বীয় সমিতি পঃ বঃ সাবর্ডিনেট ইঞ্জি. সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এলাকায় তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। উভয় সমিতির উদ্যোগে গত ১০ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে কেন্দ্রীয় স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ব্রহ্ম, মানবেন্দ্র পাল এবং অশোক পাত্র। এই স্মরণসভায় কবিতা পাঠ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রয়াত উৎপল সেনগুপ্ত'র কন্যা। □

শিক্ষা নিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কারণ, আক্রান্ত মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদেই জোটবদ্ধ হয়, অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য মিছিলে হাঁটে। আর এগুলিরই তো ফলিত প্রয়োগ এ রাজ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আপনি তা না বুঝতে পারেন, কিন্তু কর্মচারীরা তা উপলব্ধি করেন অন্তর থেকে। কর্মচারীরা জানেন বাম আমলে সংগঠনের যোগ্য নেতৃত্বেই বহুবিধ আর্থিক দাবি ও অধিকার অর্জিত হয়েছে। যা আপনি আজ কেড়ে নিতে চাইছেন। যাঁরা কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে কর্মচারীরা দাঁড়াবেন, এমন দুরাশা আপনার মনে এল কি করে? আপনি কি কর্মচারীদের অজ্ঞ ভাবেন? অবশ্য অন্ধ বিরোধিতার চশমা যাঁর চোখে, তাঁর কাছে অন্য কিছু আশা করাই বাতুলতা। তবু বলি, দয়া করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। অন্যথায় আপনার পরিণতিও আপনার পূর্বসূরিদের পথেই ঘটবে। □ **সুমিত ভট্টাচার্য**

জমায়েত ও ধর্না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ৭ম বেতন কমিশন গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা বেতন কমিশনের সুপারিশ ১.১.২০১৪ থেকে কার্য্য করা এবং বেতনের সঙ্গে ডি.এ. সংযুক্তিকরণ সহ অন্যান্য দাবীতে ১২ ডিসেম্বর '১৪ এক দিনের ধর্মঘট করেছেন। পুনরায় ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ দু'দিনের ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন, সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত ৭ম বেতন কমিশনের বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনভাতার প্রসঙ্গটি যুক্ত করার দাবী জানান।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর ১৫টি রাজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। এ ছাড়াও ৯টি রাজ্য সংগঠনের মহিলা প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব রাজ্যের মহিলা উপসমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন।

দ্বিতীয় দিনের সূচনায় ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কমঃ সুকোমল সেন ভাষণ দেন। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী দাবীগুলি নিয়ে এমন এক জোরদার আন্দোলনে নামা প্রয়োজন যাতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের এই দাবীগুলিকে তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে যুক্ত করে।

নিম্নলিখিত ৫ দফা দাবীকে কেন্দ্র করে ৬ মার্চ, ২০১৪ দেশের সর্বত্র জেলাস্তর অবধি ব্যাপক জমায়েত ও ধর্নার কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

১। **জাতীয় পেনশন আইন (এন.পি.এস-২০১৩) বাতিল**

২। **চুক্তি প্রথায় নিয়োগ এবং আউটসোর্সিং বন্ধ এবং চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ।**

৩। **সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ।**

৪। **মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।**

৫। **রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত ৭ম বেতন কমিশনের বিচার্য্য বিষয় ও সুপারিশের আওতাভুক্ত করা।**

এছাড়াও প্রতিটি রাজ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। □ **হিমাংশু সরকার**

মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জেলার সর্বত্র আলিপুরদুয়ার সহ কুমারগ্রাম, যশোডাঙ্গা, শামুকতলা, বাবুরহাট, কালচিনি, ওদলাবাড়ি, মেটেলি, নাগরাকাটা, চালসা, লাটাগুড়ি, ফালাকাটা, বীরপাড়া, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর, মালবাজার সহ সর্বত্র বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়। বিডিও মারফত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ পত্রও পাঠানো হয়।

কোচবিহার শহরে জেলাশাসকের দপ্তর সহ ৪টি সরকারী দপ্তরেই বিক্ষোভ দেখান কর্মচারীরা। এছাড়াও তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা সহ বিভিন্ন মহকুমায় কর্মসূচী সংগঠিত হয়েছে।

মালদহের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরেও এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচীতে শামিল ছিলেন কর্মচারী সমাজ। উত্তর দিনাজপুরে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক পাত্র।

উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সদর সহ জেলার প্রতিটি মহকুমার অধিকাংশ অফিস, দপ্তরে প্রতিবাদী রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বিক্ষোভে শামিল হন। হুগলী জেলার কালেক্টরেট দপ্তর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, সদর মহকুমা দপ্তরগুলি সহ পাণ্ডুয়া ব্লক, পোলবা ব্লক, পিপুলপাতি সেক্টর, আরামবাগ মহকুমার এসডিও দপ্তর সহ ১৩টি দপ্তরে, চন্দননগর মহকুমার চাঁপদানি, ভদ্রেশ্বর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, চন্দননগর ইরিগেশন দপ্তর, গোরহাটি ইএসআই হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরেট, জাজেস কোর্ট, পিএইচই দপ্তর, সেচ দপ্তর, কৃষি দপ্তর, এসডিএলআরও, নারায়ণগড়, খড়্গপুর-১ ও ২, ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ, সবং, ডেবরা ব্লক অফিসগুলিতে বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বীরভূম জেলা সদর সিউড়ি, বোলপুর, রামপুরহাট সদর সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া সদর মহকুমায় ৭টি জায়গায় এবং বিষ্ণুপুর, খাতরা মহকুমায় ৯টি জায়গায় কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি ও অগণতান্ত্রিক মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে শামিল হয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারী ছুঁড়ে দেন। এদিনের কর্মসূচী মুখ্যমন্ত্রীর ঘৃণ্য মন্তব্যের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসনের বৃহত্তম সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে মুখ্যমন্ত্রীর অগণতান্ত্রিক হুমকির প্রতিবাদে কলকাতায় ধর্মতলা থেকে কলেজ স্কোয়্যার পর্যন্ত বিশাল মিছিলের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। □ **সুব্রত কুমার গুহ**

অমর একুশে...

অশোক পাত্র
সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বছর ঘুরে আবার একুশে ফেব্রুয়ারি, আবার আবদুল গফ্‌ফর চৌধুরী রচিত সেই অমর গাথা ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি''...। ১৯৫২-এর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতিসত্তা স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবোধের যে উন্মেষ ঘটেছিল তার মধ্যেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন বরকত-রফিক-সালাম-জব্বার সহ চোদ্দ জন। শুধুমাত্র ভাষার জন্য রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে শহীদের মৃত্যুবরণ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল অবিস্মরণীয় ঘটনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য চক্রান্তে মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী দ্বিজাতি-তত্ত্বের অথবা সোজা কথায় ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের ভিত্তিটাই যে ভুল ছিল তা ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার ৫ বছরের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যে।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ। পাকিস্তানের বড়লাট মহম্মদ আলি জিন্না ঢাকায় এসে ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, ''উর্দু কেবলমাত্র উর্দুই হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা (urdu and urdu shall be the state language of Pakistan)'' সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থলে উপস্থিত ছাত্র সমাজ No-No বলে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে গর্জে উঠেছিলেন। শহীদের রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির অহঙ্কার। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র পাকিস্তানী দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রান্ত রূপ উন্মোচন করে দেয় বাঙালিরাই। প্রমাণিত সত্য যে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। বিভক্ত দেশ আবার ভাগ হয়ে যায়। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। কেননা ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের যে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ হিসাবে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল। জাতির জীবনে নেমে আসা সেই ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রমূলক অন্যায়কে ক্ষমতা লিপ্সায় কংগ্রেস দল এবং তৎকালীন রাজনৈতিক নায়করা জাতির জনক গান্ধীজির চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা যে কোনভাবেই এই ভূখণ্ডের মানুষের স্বাধীনতা ছিল না তা টের পেতে এই ভূখণ্ডের 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের অতি বড় সমর্থকেরও বেশি দেরি হয়নি। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই মহম্মদ আলি জিন্নার উপরোক্ত বক্তব্য এবং তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের অব্যবহিত পরেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনে শৃঙ্খলিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর জেহাদ আসলে ছিল সেই ঔপনিবেশিকশাসন ও শোষণ চালিয়ে যাওয়ার ঘৃণ্য কৌশল। কেননা ভাষা যদি না বাঁচে তাহলে সংস্কৃতিও বাঁচে না, আর সংস্কৃতি না বাঁচলে জাতি বাঁচে না। তাই এই আঘাত, এই ঘৃণ্য অপকৌশল। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার লেনিন জাতিসত্তার প্রশ্নে রোজা লুক্সেমবুর্গের একটি রচনা নিয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, প্রতিটি জাতির মধ্যেই শোষক ও শোষিত অংশ থাকে এবং এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় ঘটে তার ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি দিয়ে। আর সেই জনগোষ্ঠীর শোষিত অংশ যদি ক্ষমতা দখল করে তাহলে পুঁজিবাদী যাবতীয় পশ্চাদপদতা দূর হয়ে গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

অমর একুশের বীরগাথা শুধু তার শহীদদের রক্ত তর্পণের স্মরণে নয়। সারা দুনিয়া দেশ ও জাতির এই ঘোর দুর্দিনে শুধুমাত্র মাতৃভাষার জন্য জীবন বিসর্জনের ইতিহাস এখনো আমাদের জীবনে আরো আরো বেশী প্রাসঙ্গিক। যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখি তাহলে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, পরাধীন ভারতে বাংলা তথা সারা দেশে যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার প্রধান হাতিয়ার ছিল মাতৃভাষা। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদানও ছিল। কিন্তু রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল-বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মাতৃভাষার যে সারস্বত সাধনা তাঁরা করেছিলেন তা এক দিকে যেমন আমাদের চেতনা বা জ্ঞানকে পুষ্ট করেছিল, অন্যদিকে তেমনি সেই জ্ঞানের আলোকেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল এবং কুসংস্কার বিরোধী সামাজিক আন্দোলন সহ জ্ঞান বিকাশের যে অগ্রগতি ঘটেছিল সেই পথ বেয়েই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামী চেতনা উদ্বেলিত হয়েছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য সেই চেতনা ব্যাপ্ত হয়েছিল সারা দেশব্যাপী অবিভক্ত ভারতে রাষ্ট্রের কাজকর্ম কোন ভাষায় চলবে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার পাবে কিনা, তার নিজ নিজ প্রদেশের প্রশাসনিক কাজ নিজ নিজ ভাষায় পরিচালনা করার অধিকার পাবে কিনা প্রভৃতি নানা প্রশ্ন পরাধীন ভারতে বহু বছর আগেই জনমানসকে আলোড়িত করেছিল। তাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যত প্রসারলাভ করেছে, জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার যতই বিকাশ ঘটেছে, ততই বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের ভিতর নিজ নিজ জাতীয় অধিকারবোধও বেড়ে উঠেছিল। অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি একথা উপলব্ধি করেছিল যে নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষালাভ করা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার অধিকার তাদের জাতীয় মুক্তির অপরিহার্য শর্ত। তাই জাতীয় মুক্তির অন্যতম মৌলিক অধিকার রূপেই বিভিন্ন ভাষার দাবি অবিভক্ত ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ জোরের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ভাষার দাবি না মেনে নিলেও এই ধারণাতেই স্বাধীন ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি তাও যথাযথভাবে রূপায়িত হয়নি। ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলে কাজে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তৈরি করে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে তা অন্য ভাষাভাষীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাই ১৯৬১ সালের ১৯শে মে আসামের বরাক উপত্যকার শিলচরে মাতৃভাষা বাংলার জন্য শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালায় স্বাধীন ভারতবর্ষের পুলিশ। গুলি করে হত্যা করে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ১১ জনকে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে যেমন তেমনি ভারতবর্ষেও মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় সুকোমল, কানাইলাল, কমলা সহ ১১ জন শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার দাবীকে তৎকালীন আসাম সরকার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। যেমন শেষ পর্যন্ত প্রবল গণআন্দোলনের চাপে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালি তথা বাংলা ভাষার জন্য ভাষা আন্দোলনের শহীদদের জীবন দান আজ গৌরবান্বিত ১৮৮ সদস্য বিশিষ্ট জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতিতে। ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে এই দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এখন বিশ্বে প্রায় ২৮ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। সারা দুনিয়ায় ভাষার জনসংখ্যার বিচারে বাংলাভাষার স্থান পঞ্চমে।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে প্রয়াত প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় লিখেছিলেন, মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের সকলের জানা ছিল। কিন্তু জানা ছিল না মাতৃভাষার জন্যে আক্ষরিক অর্থে জীবনদান। ঢাকার তরুণরা সেদিক থেকে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। আমরা সেই ঐতিহাসিক দিবসটিকে আজও নতমস্তকে অভিবাদন করি। এর পেছনে কিছু রাজনীতি ছিল। কিন্তু সেটা তুচ্ছ। যেটা ইতিহাসের সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে সেটা মাতৃভাষার মর্যাদার জন্যে চরম আত্মত্যাগ। যার তুলনা এর আগে দেখা যায়নি। সেই প্রথম, তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন।

বাদশা হুজুর/খাঞ্জা খান/নবাব হুজুর/গাঞ্জা খান/দুইজনাতে যুক্তি করে/ জারি করেন এই বিধান—/এখন থেকে প্রজারা সব/ময়না তোতার হোক সমান/নতুন জবান শিখুন ওরা/ভুলুক ওদের নিজ জবান,/মুখের মত জবাব দিল/কয়েকজনা নওজওয়ান/মানুষ ওরা নয়কো পাখী/বলবে নাকো নয়া জবান,/গুলির মুখে দাঁড়ায় রুখে/অকাতরে হারায় জান/রক্তে রাঙা মাটির পরে/ওড়ে ওদের জয় নিশান।

যথার্থই মাতৃভূমির জন্য বা ধর্মের জন্য মৃত্যুবরণ বহু পুরাতন ঘটনা। দেশের জন্য মরণপণ পুরাতন না হলেও খুব নতুনও নয়। কিন্তু ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন নিশ্চিতরূপে নতুন, আর সে ভাষা আমাদেরও মাতৃভাষা।

অমর একুশের স্মরণে 'বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতায় কবি শামসুর রহমান লিখেছেন ''বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন... বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত চেনাছবি... নানী বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে রমজানী সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া আর একুশের প্রথম প্রভাতফেরী, অলৌকিক ভোর।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী যিনি 'আমার ভাইয়ের রক্তে, রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি'-র অমর স্রষ্টা, তাঁর রচনায় লিখেছেন, ''দেশ অনেক সময় মানুষকে মেলাতে পারেনি। ধর্মও পারেনি কিন্তু সংস্কৃতি মানুষকে অনেক সময়েই মিলিয়ে দিয়েছে। এজন্য সংস্কৃতি বিশেষত, গণসংস্কৃতির ওপর বারবার আঘাত এসেছে। স্বৈরাচারী শাসক জনসংস্কৃতিকে সব থেকে বেশি ভয় পায়। কারণ জনসংস্কৃতির মধ্যেই সেই শক্তি থাকে যা মানুষকে জাগায়।'' তাই আমরা দেখি সেই দ্বি-জাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ভেদ ভাবনা থেকে জন সম্মতি ব্যতিরেকে সৃষ্ট পাকিস্তান আমল থেকেই আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে চেষ্টা করেছে যাতে জনসংস্কৃতি প্রসারলাভ করতে না পারে। আর ভাষা যেহেতু জনসংস্কৃতি বা ব্যাপক অর্থে জাতিসত্তা বিকাশের একটি প্রধান হাতিয়ার সেজন্য ভাষার উপর শাসকশ্রেণী বারে বারে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। তবুও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ভোলানো যায়নি।

যে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইসলামিক পূর্ব পাকিস্তানের অবসান ঘটিয়ে লাখো শহীদের রক্তে রাঙা হাজার হাজার নির্যাতিতা রমণীর কান্না ভেজা পথে ১৯৭১-এর যে মুক্তিযুদ্ধের সফল সংগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ অতি দ্রুত পুনরায় মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে আবার আজ যখন কলুষিত তখনো সংগ্রাম থেমে নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী সেখানকার জামাত-ই-ইসলামি, রাজাকার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে খুন, জখম, ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যালীলা সংগঠিত করে। সেই ঘটনার বিরুদ্ধে এতকাল বাদে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল ছাত্র-যুব-মহিলা-সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপক সংখ্যায় সমবেত হয়ে শাহবাগ আন্দোলন গড়ে তুলে সেই অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। স্বাধীনতার এত বছর বাদে স্বাধীন বাংলাদেশের জনক মুজিবর রহমান সহ সেদেশের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী, মহিলাদের উপর নারকীয় পাশবিক অত্যাচারের নায়কদের বিরুদ্ধে 'ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি' অথবা সেই নারকীয় অপরাধীদের বিচার চেয়ে মৌলবাদীদের হাতে নিহত আহমেদ রাজীব হায়দর শহীদের মৃত্যুবরণের পর স্বতঃস্ফূর্ত শাহবাগ আন্দোলনে সেই ঘাতকদের বিচার চেয়ে বাংলাদেশের যৌবনের উত্তাল আন্দোলন ইতিহাসের আর এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই আন্দোলন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ মৌলবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষায় বাঙালী জাতিসত্তার গৌরবময় উত্থান। কিন্তু আমাদের দেশ বিশেষত, আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল তৃণমূল সরকারের তিস্তা জলবণ্টনে অনমনীয় নেতিবাচক অবস্থান বাংলাদেশের সেই গৌরবময় সংগ্রামের বিরুদ্ধে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার শক্তির হাতকেই শক্ত করছে যা শুধু অনভিপ্রেত নয়— চরম অবাঞ্ছিত। তাই রাজ্য সরকার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অনভিপ্রেত অবাঞ্ছিত কাজের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করতে হবে 'অমর একুশে'র এই রক্তক্ষরা দিনে।

বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির ভয়ঙ্কর আক্রমণে সমগ্র পৃথিবীতে নেমে এসেছে চরম অর্থনৈতিক মন্দা। আর সেই নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে বা তার অভিঘাতে যখন আমাদের দেশ সহ উন্নতিকামী ও অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্ব ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। যখন সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি প্রসূত সর্বগ্রাসী সংকট চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী পিছিয়ে পড়া দেশের মানুষের উপর। তখন সর্বত্র চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক অধিপত্যবাদে মাতৃভাষাগুলি ঘোর বিপন্ন। বিশ্বায়নের যুগে সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। যুব সমাজকে ভোগবাদের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে চিরায়ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি, কারণ যে কোন দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যদি ধ্বংস করে দেওয়া যায় তবে সেই দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়। আর আগেই আলোচিত হয়েছে যে, ভাষা শুধু ভাব প্রকাশ নয়, ভাষা হল সংস্কৃতি-স্বাজাত্যবোধ-জাতি সত্তার আইডেনটিটি। তাই সেই পরিচিতি রক্ষায় আমাদের জীবন পণ করতে হবে। তবেই হবে সত্যিকারের ভাষা শহীদ তর্পণ— 'অমর একুশে' আমাদের সেই কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবি অরুণ মিত্রের ভাষায়—

''আমার বাংলাভাষাকে যারা ছলে বলে দাবাতে চায়
তারা যেন একবার চোখ খুলে তাকায়,
একুশে ফেব্রুয়ারী
তাদের সামনে এক প্রচণ্ড হুঁশিয়ারী।''

আমাদের সেই পথেই এগোতে হবে।□

ব্যাঙ্ক শিল্পে ধর্মঘট

বিগত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দেশ জোড়া ৪৮ ঘণ্টার সফল সর্বাত্মক ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সংগঠিত হয়ে গেল। এই শিল্পে আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রায় ১০০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী ৯টি সর্বভারতীয় সংগঠনের যৌথ মঞ্চ—ইউ এফ বি ইউ যৌথ ভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। দেশের ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রায় ৫০,০০০ শাখার সমস্ত তো বটেই, বন্ধ ছিল প্রশাসনিক দপ্তর, বিদেশি মুদ্রা বিনিময় দপ্তরসহ ক্লিয়ারেন্স বিভাগ। এমনকি সমস্ত এ টি এম-গুলিও বন্ধ ছিল। হয়নি কোনো চেকের 'ক্লিয়ারেন্স'। কর্মরত অফিসার ও কর্মচারীদের সঙ্গেই শামিল হন অবসর-প্রাপ্ত কর্মীরাও।

কেন্দ্রীয় সরকার গত দুই দশকের বেশি সময় দেশে নয়া উদার আর্থিক নীতির বিপজ্জনক প্রয়োগ ঘটিয়ে চলেছে। তার ফলে দেশের ব্যাঙ্ক শিল্পে ঘনিয়ে এসেছে সঙ্কট। দেশের জনগণের সঞ্চিত আমানত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক খেলায় মেতেছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং সেক্টরে স্থায়ী পদ মুছে দিয়ে আউটসোর্সিং, খান্ডেলওয়াল কমিটির কর্মচারী বিরোধী সুপারিশ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখা বন্ধ করা, নয়া ব্যাঙ্ক লাইসেন্সিং পলিসি সহ সরকারের যাবতীয় জনবিরোধী ও শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধেই এই সর্বাত্মক ধর্মঘট। এছাড়াও পূর্বতন বেতন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর নভেম্বরের ১ তারিখ। তারপর এক বছর তিন মাস কেটে গেলেও কর্তৃপক্ষ দেখিয়ে চলেছে সীমাহীন টালবাহানা। বাজারে পণ্যের দর একশ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষ মাত্র ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়, যা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় খুবই নগণ্য।

গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও ধর্মঘট হয়েছে সর্বাত্মক। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ যদি এইরকম অনড় মনোভাব বজায় রাখে, তবে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তর সমৃদ্ধি ভবনে পুলিশ ডাকে এবং ১৪৪ ধারা প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। কিন্তু কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের এই কু-পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়। ৪৮ ঘণ্টার এই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট দেশে উদারনীতি বিরোধী শ্রমজীবীদের আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। □

প্রণব কুমার কর

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
42nd Year 10th Issue, February 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

‘খাপ পঞ্চায়েত’— আমরা মানবো কি?

পঞ্চায়েত শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমাদের মনের কোণে সেই ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থাটিই ভেসে ওঠে। যেখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমনই একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের আশু সমস্যা সমাধান সম্ভব। আমরা সাধারণত এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, গ্রামীণ দিল্লীতে ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে আছে ‘খাপ পঞ্চায়েত’, অর্থাৎ এই পঞ্চায়েতে হর্তাকর্তারা নির্বাচিত হন না, কিন্তু সমস্ত অঞ্চলেই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। ‘খাপ পঞ্চায়েত’ সাধারণত জাতপাত কেন্দ্রিক হয়। এই সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিরা আজও এদেশে তাদের নিষ্ঠুর বিধান জারি করে প্রতিদিন কত শত ‘সম্মানজনক মৃত্যু’ বা হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমাজপতিরা এতটাই ক্ষমতাশালী যে একমাত্র বামপন্থীরা ছাড়া অন্য কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল, সে কংগ্রেস বা বিজেপি কেউই এদের অমানবিক অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না, এমনকি আঞ্চলিক দলগুলিও মুখে কুলুপ এঁটে থাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। তিন বছর আগে পর্যন্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী এই বাংলায় বসে ‘খাপ পঞ্চায়েতের’ বিভিন্ন অমানবিক কার্যকলাপ অনুভব করতে পরতাম না। কিন্তু আজ পারছি। গত তিন বছরে আমাদের রাজ্যেও বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকারের হাত ধরে ‘খাপ পঞ্চায়েত’ গুটি গুটি পায়ে ঢুকে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, নজরুল, রামমোহন, বিবেকানন্দ, নেতাজির চরণধুলায় ধন্য শিক্ষা, সুস্থ সংস্কৃতির প্রশংসা তিন বছর আগে পর্যন্ত দেশে-বিদেশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। আজ সেই গৌরব বা প্রশংসায় কলঙ্কের ক্ষত স্পষ্ট হল।

বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের আদিবাসী গ্রাম সুবলপুরের বিশ বছরের তরুণী তার গ্রামের ছেলেদের উপেক্ষা করে তার পাশের গ্রামের একটি ভিন্ন বর্ণ, ধর্মের ছেলে শেখ খালেককে ভালবেসে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এই অপরাধে গত ২১ জানুয়ারি সুবলপুর গ্রামের মোড়ল বলাই মাড্ডি সভা ডেকে ওই তরুণীর পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করে। পিতৃহীন তরুণীর অভাবী পরিবার এই জরিমানা দিতে অপারগ হওয়ায় গত ২২ জানুয়ারি মোড়ল সুবল মাড্ডির হুলিয়ায় আদিবাসী যুবকেরা রাতের অন্ধকারে ওই তরুণীকে তুলে নিয়ে এসে প্রথমে মোড়ল নিজে ও পরবর্তীতে মোড়লের নিদানে ১২ জন যুবক পরপর ওই তরুণীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে তার বাড়ীর সামনে ফেলে রেখে যায়। অসুস্থ তরুণীর চিকিৎসার পর বর্তমানের আশ্রয়স্থল একটি হোম। ১৩ জন অপরাধীকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু এই দলবদ্ধ নৃশংস ধর্ষণের ঘটনায় সারা রাজ্যজুড়ে যখন ঝড় বইছে, তখন ওই ঘটনায় ধৃতদের ২৩ জানুয়ারি যখন আদালতে তোলা হয়, তখন অদ্ভুতভাবেই কোন সরকারী আইনজীবী সেখানে উপস্থিত হন নি। শাসকদলের স্থানীয় নেতার নাম এই ঘটনায় জড়িত থাকায় এই অনুপস্থিতি। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের বিরাগভাজন না হতেই পুলিশও তদন্ত এড়াতে চান। আবার কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, মুর্শিদাবাদের চুয়াগ্রামের গণধর্ষণ কাণ্ড সহ অসংখ্য সামাজিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত সামনে আসা মাত্রই অতীতে যে মানবাধিকার কমিশন বারবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে, অথচ এবার লাভপুরের এই পৈশাচিক ঘটনা সামনে আসার পরেও কমিশনের অস্থায়ী চেয়ারম্যান তথা রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি নপরাজিত মুখোপাধ্যায়ের তরফে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এই নিষ্ক্রিয়তা কিসের পরিচয়?

অবশেষে আসি রাজ্যের কর্ণধার মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা প্রসঙ্গে। তিনি বর্তমানে রাজ্য সুখ ভুলে দিল্লীর মসনদ দখলের লক্ষ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন, অথচ তাঁর রাজ্যের মহিলাদের মান-ইজ্জত যে লুটেরাদের হাতে চলে যাচ্ছে তাতে একজন মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা একজন মহিলা হিসাবেও কোন অনুভূতি তাঁর নেই। গোটা রাজ্য জুড়ে যখন মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তখন তিনি ‘ছোট’, ‘সামান্য’ ঘটনা বলে রাজ্যজুড়ে উৎসবে মেতে উঠেছেন। নৃশংসতা, বর্বরতার অপরাধে দুষ্কৃতীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও তিনি ও তাঁর মন্ত্রীবর্গরা ছাড়িয়ে আনেন। স্বভাবতই দুষ্কৃতীরাও বুঝে গেছে, এরাজ্য এখন তাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র, তারা স্বাধীন মুক্ত। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হলেও, তিনি মহিলাদের সম্মান ইজ্জতকে নির্ধারণ করেন টাকার অঙ্কে। তাই তো লাভপুরের আদিবাসী তরুণী যখন বর্বরোচিতভাবে আক্রান্ত তখন তিনি আশ্বস্ত করেন নির্যাতিতার পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর করে দেওয়ার, নির্যাতিতার মাকে বিধবাভাতা দেওয়ার অথবা তার পরিবারকে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার। এই নাটকের কারণ তাঁর ও তাঁর সরকারের ব্যর্থতা ঢাকা ও এই পরিবারকে চুপ করিয়ে দেওয়া। তিনি এভাবেই তাঁর ও তাঁর দল বা প্রশাসনের সমস্ত দুষ্কর্ম ঢাকতে উদ্যোগ নেন। যিনি একটি রাজ্যের মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে ব্যর্থ, তিনি দেশ চালানোর স্বপ্ন দেখেন, বিষয়টি আমাদের সকলকেই ভাবতে হবে।

মনে রাখতে হবে নারী আন্দোলনে এই রাজ্য সবচেয়ে শক্তিশালী। শিক্ষার অগ্রগতি মহিলাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর মহিলাদের অগ্রগতি, তাদের সম্মান রক্ষায় সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা ছিল বামফ্রন্ট সরকারের। ঠিক সেই কারণেই মহিলাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার একটি ঘৃণ্য অপকৌশল গ্রহণ করেছে রাজ্যের দুষ্কৃতীবাহিনী। নারীর সম্ভ্রম, মর্যাদায় আঘাত করতে পারলে একটি সম্পূর্ণ পরিবার আহত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, হিটলার, মুসোলিনিও মেয়েদের উপর চরম আঘাত নামিয়ে এনেছিল, কিন্তু আজ তাদের স্থান হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। □ **কুমকুম মিত্র**

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সর্বাত্মক ধর্মঘট

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী নীতিগুলি এবং নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে দেশের ১০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা গত ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ৪৮ ঘণ্টা ব্যাপী দেশজোড়া ঐতিহাসিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পদোন্নতি, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদির সঙ্গে রয়েছে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবী যা আঘাত করবে রাষ্ট্রের সেইসব নীতিকে যা দেশে তৈরী করেছে বিপুল বৈষম্য। ধর্মঘট দাবি করেছে শূন্যপদ পূরণের। ‘আউটসোর্সিং’ বন্ধ করার, অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করার, ট্রেড ইউনিয়নের আলোচনার সুযোগের জন্য বিধিবদ্ধ জে.সি.এম ব্যবস্থার কার্যকরী রূপ ইত্যাদি। ভারত সরকারের ডাক বিভাগকে চালু রাখার জন্য বিশেষ অবদান রাখেন গ্রামীণ ডাক সেবকরা। যারা ই.ডি. কর্মী নামেই পরিচিত। বেদনার হলেও সত্য এই পৌনে তিন লক্ষ ডাক সেবক কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পেনশন, মর্যাদা কিছুই পান না। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কনফেডারেশনের ডাকে এই ধর্মঘট দাবী করেছে ডাক বিভাগের এই কর্মীদের বেতনভাতা সমেত চাকরির শর্তাবলী সপ্তম বেতন কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কনভেনশনে মত দিলেও ভারত সরকার সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার দিতে চায় না। ফলে আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীরা বারবার আক্রান্ত হয়েছেন। তাই ধর্মঘটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবী হচ্ছে দেশের সর্বত্র কর্মচারী সংগঠনের কর্মী সংগঠকদের ওপর জারি থাকা সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার দিয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২০১২ সালের ১২ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের এক দিনের সফল ধর্মঘটের পর কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে সপ্তম বেতন আয়োগ গঠন করেছেন এবং ১/১/২০১৬ থেকে এই বেতন আয়োগের সুপারিশ কার্যকরী করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মহার্ঘভাতার সংযুক্তিকরণ বা অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা কোনো কিছুই ঘোষণা হয়নি। ফলতঃ কনফেডারেশন দাবী করেছে সপ্তম বেতন আয়োগের সুপারিশ অন্তত ১/১/২০১৪ থেকে কার্যকরী করা হোক।

ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান দাবী পেনশন আইনের পরিবর্তন। একই দপ্তরে একই ধরনের কাজের জন্য দু'রকম পেনশনের সুযোগ রাখা অন্যায়।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলিতে প্রচুর শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। সেখানে শূন্যপদগুলি পূরণ করতে হবে। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। ঠিকাদারি প্রথা বিলোপ করতে হবে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে। এই সবই ধর্মঘটের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এই ধর্মঘট সর্বাত্মক চেহারা নিয়েছে। ডাক বিভাগ, আয়কর দপ্তর, কাষ্টমস, সিভিল অ্যাকাউন্টস, সাপ্লাই ডিসপোজাল, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া প্রেস, অ্যাডভান্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জি.এস.আই., বোটানিক্যাল সার্ভে, মেডিক্যাল স্টোর ডিপো, ভারতীয় জাদুঘর প্রভৃতি দপ্তরগুলিতে ধর্মঘট ব্যাপক আকার নিয়েছে।

আবার ধর্মঘটের প্রথম দিনে পার্ক স্ট্রিটে কিড স্ট্রিট এলাকায় জি.এস.আই., দপ্তরে তৃণমূলের পতাকা লাগানো গাড়িতে চেপে এসে হামলা চালায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। দ্বিতীয় দিনেও একইভাবে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা জড়ো হয় জি.এস.আই. দপ্তরের সামনে। কিন্তু কর্মীদের প্রতিরোধে তারা পিছু হটে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের এই সফল ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের রাজ্যের শাসকদল মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের উদারনীতির বিরোধিতা করেন এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য নয়া পেনশন বিলের বিরোধিতা করেন কিন্তু সেই নীতিকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে যখন ধর্মঘটের কর্মসূচী নেওয়া হয় তখন এরা তার মারমুখী বিরোধিতা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের এই সাহসী লড়াই নয়া উদারনীতি বিরোধী লড়াইকে প্রেরণা যোগাবে। দেশের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবীরাও এই লড়াই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে আগামী দিনে। □

রাজ্য সরকারের অপব্যয়ের বহর

বাজারে ঋণ নিয়ে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের লাগাতার বিভ্রান্তির এবং অপপ্রচারের ধারাবাহিক কুৎসা চলছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও বর্তমান সরকারের বিলাস, উৎসব, মেলা সহ অপব্যয়ের উদাহরণ-

(১) ২০১৪ সালে ৬০টি মেলা/উৎসব করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে সরকারের প্রশাসনিক ক্যালেন্ডারে। খরচ হবে কয়েক কোটি টাকা।

(২) আমাদের মহার্ঘভাতা এখনো পর্যন্ত বাকি ৪২ শতাংশ। মহার্ঘভাতা প্রদান সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এর অর্থ সরকার মনে করে মহার্ঘভাতা অধিকার নয়, ভিক্ষার অনুদান মাত্র। কিন্তু মন্ত্রীদের ভাতা বেড়েছে। ২০১১ ডিসেম্বরেই চেয়ারে এসে বসার জন্য মিটিং অ্যালাউন্স চালু। অফিসে এসে চেয়ারে বসলেই দৈনিক ১০০০ টাকা। ২০১২-এর শেষের দিকে মন্ত্রীদের বেতনের পুনর্বিন্যাস হয়।

পদ	ছিল (টাকা)	হয়েছে (টাকা)	বৃদ্ধির হার (শতাংশ)
পূর্ণমন্ত্রী	৭,৫০০	১২,০০০	৬০
মুখ্যমন্ত্রী	৮,০০০	১২,০০০	৫০
রাষ্ট্রমন্ত্রী	৭,১০০	১২,০০০	৬৯

(৩) নতুনপদ তৈরি হয়েছে ‘পরিষদীয় সচিব’। রাজ্যে মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রীর মোট সংখ্যা ৪৪ জন। ২৬ জন ‘পরিষদীয় সচিব’ হয়েছেন। তারা রাষ্ট্রমন্ত্রীর সম-মর্যাদা সম্পন্ন। রাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতো সিটিং অ্যালাউন্স এবং বেতন পাচ্ছেন। হিসেব মতো তৃণমূলের ১৮৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৭০ জনই কোনো না কোনোভাবে মন্ত্রী।

(৪) মেলা উৎসবের দিকে তাকানো যাক। সারদা গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতারিত ৯২৯ জনের মোট ৪১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০০ টাকার চেক দেওয়া উপলক্ষে কয়েক হাজার লোকের খাওয়া-দাওয়া, মঞ্চ-মাইক ইত্যাদিতে খরচ হয় ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঐ তারকা খচিত ঝাঁ চকচকে বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা সহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

(৫) মহাকরণ থেকে নবান্নে রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র সরিয়ে নিতে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীদের, আমলাদের ঘর সাজিয়ে তুলতে খরচের বহরের পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা।

(৬) মুখ্যমন্ত্রীর সফরের জন্য একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করেছে রাজ্য সরকার। মাসে ৪০ ঘণ্টার ভাড়া ৫০ লক্ষ টাকা।

(৭) টাকা নেই অথচ প্রতিদিন পছন্দের এবং বশংবদ খবরের কাগজে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ উন্নয়নের (পড়ুন ধাপ্পার) বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন। ৩২ মাসে এই বাবদ খরচের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোনো মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল।

রাজ্যের ঋণ প্রদত্ত তথ্য ঃ বর্তমান সরকারের অর্থ দপ্তরের সূত্রে জানা যাচ্ছে যে ২০১১ সালের ১৩ মে যেদিন বিধানসভার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে, সেদিন রাজ্যের মোট ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। যদি ধরে নেওয়া যায় বিগত বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে যখন ক্ষমতায় আসে তখন রাজ্যের ঘাড়ে কোনো ঋণ ছিল না। তাহলে ৩৪ বছরে ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা ঋণ হয়েছে রাজ্যের। বিপরীতে চলতি আর্থিক বছরে (২০১৩-১৪)-র শেষে আগামী মার্চে রাজ্যের ঋণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে এই রাজ্য এখন সারা দেশে শীর্ষে। বিগত সরকারের আমলে অবস্থান ছিল ত্রয়োদশ স্থানে। অর্থাৎ বর্তমান সরকার আড়াই বছরে ঋণ বাড়িয়ে দিয়েছে ৫৫ হাজার কোটি টাকা। □

পরমেশ দে, প্রণব কর, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চায়েতে দলত্যাগ-বিরোধী আইন শিথিল

বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার বিধানসভায় পঞ্চায়েত আইনের নয়া সংশোধনী বিল পাস করিয়েছে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। সরকার পক্ষের বক্তব্য, এই সংশোধনী আনায় আইনটি ফিরে গেল কুড়ি বছর আগের চেহারায়। বিরোধীদের বক্তব্য, এই বিল পাস হওয়ার ফলে দলত্যাগবিরোধী আইন দুর্বল হবে এবং দলত্যাগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বিরোধীদের আরও বক্তব্য, পঞ্চায়েতের যেটুকু বিরোধীদের দখলে আছে, এই সংশোধনীর পর সেগুলিও শাসকদল দখল করতে সফল হবে।

ঘটনা হল ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে বিগত বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৪ সালে সংশোধনী এনে দলত্যাগ বিরোধী আইন শক্তিশালী করেছিল। ১৯৮৫ সালে কেন্দ্র দলত্যাগ বিরোধী আইন চালু করার পরে ১৯৯৪ সালে পঞ্চায়েত আইনে সেই সংশোধন করে বামফ্রন্ট সরকার। পরে কেন্দ্রীয় আইনকে আরও কঠোর করা হলে ২০১০ সালে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত আইন পরিবর্তন করে নেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট আমলে সংবিধানের দশম তফসিলের সাথে সঙ্গতি রেখে দলত্যাগ বিরোধী আইন সংশোধন করে পঞ্চায়েত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান সংশোধনীতে সংবিধানের নির্দেশকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। পুরাতন আইনে বলা ছিল যে, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে যদি অন্তত্তপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পৃথক গ্রুপ গঠন করে ভোট দেয়, সেক্ষেত্রে তাদের সদস্যপদ খারিজ করা যাবে না। তবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের আইনে দলীয় নির্দেশ অমান্যকারী ন্যুনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে কমপক্ষে তিনদিন আগে তাঁদের দলীয় নির্দেশ অমান্য করার কথা জানাতে হত। না জানিয়ে এই কাজ করলে দলত্যাগ বলে গণ্য করা হত।

নয়া সংশোধনীতে আগাম জানানোর কোনো সংস্থান রাখা হয়নি। যার ফলে, দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোটদান করার অধিকারকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি নয়া সংশোধনীতে দলনেতার অনুমতি নিয়ে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সংস্থানও রাখা হয়েছে।

পুরাতন আইনে বলা ছিল, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে ভোটদান অথবা ভোটপর্বে গর হাজির থাকলে সেই পঞ্চায়েত সদস্য দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়বেন।

নয়া সংশোধনীতে ‘গর হাজির’ শব্দটিকেই তুলে দিচ্ছে সরকার। যার অর্থ, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে কোনো পঞ্চায়েত সদস্য ভোট পর্বে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর সদস্যপদ বাতিল করার কোনো ব্যবস্থা থাকছে না।

বিরোধীদের অভিযোগ, এই নয়া সংশোধনী পঞ্চায়েত দখল করার ষড়যন্ত্রকে আইনী ভিত্তি দেবে। আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ ফেব্রুয়ারি প্রথম পাথায় এই বিষয়টিকে সংবাদ করে লিখেছে, “... কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী, দুই-তৃতীয়াংশের কম সাংসদ বা বিধায়ক একসঙ্গে দলত্যাগ করলে দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়বেন। খারিজ হয়ে যাবে তাঁদের আইনসভার সদস্যপদ। সূর্যবাবু (সূর্যকান্ত মিশ্র) জানান, সংবিধানের দশম তফসিল মেনে এবং লোকসভা ও বিধানসভার দলত্যাগ বিরোধী আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আইনটি ফের সংশোধন করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, এ দিনের সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও উপেক্ষা করল রাজ্য।”

ঐ খবরেই আনন্দবাজার পত্রিকা ছেপেছে, “কংগ্রেস বিধায়ক মানস ভুঁইয়ার অভিযোগ, ‘এর ফলে দলবিরোধী আইন দুর্বল হবে, দলত্যাগ সফল হবে। এই বিল কার্যকর হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে’।

বিল পেশের পর তীব্র বিরোধিতা করেন বামফ্রন্ট বিধায়করা। ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে যায় বিরোধীদের মত। কংগ্রেস বিধায়করা ওয়াক আউট করেন। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।